বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

www.parwana.net

ডিসেম্বর ◆ ২০২১

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)'র

আত্‌তানভীর

[তাফসীরুল কুরআন]

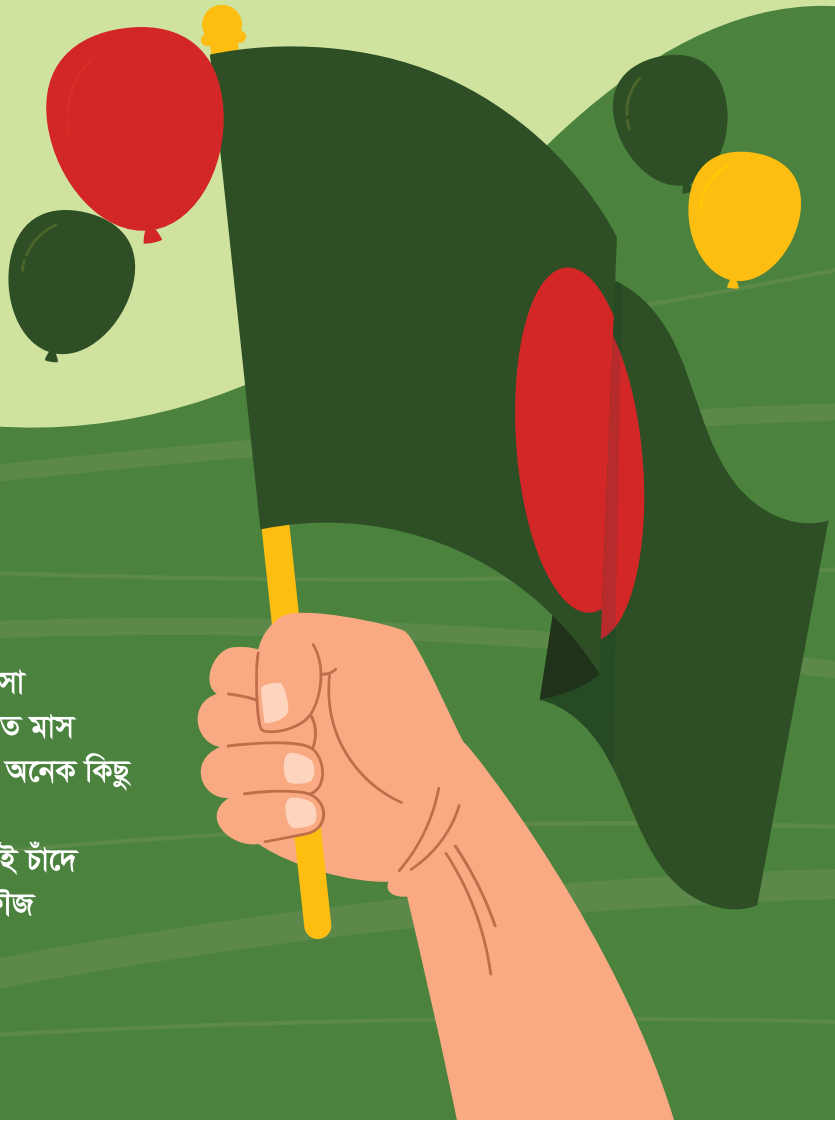

নিয়মিত

- জীবন জিজ্ঞাসা
- একনজরে গত মাস
- জানার আছে অনেক কিছু
- বিজ্ঞান
- এই মাসে এই চাঁদে
- আবাবীল ফৌজ
- কবিতা
- চিঠিপত্র

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
২৮তম বর্ষ ■ ১২তম সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০২১ ♦ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৮ ♦ রবি. সানী-জমা. আউ. ১৪৪৩

পৃষ্ঠপোষক
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আহমদ হাসান চৌধুরী

সম্পাদক
রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক
আখতার হোসাইন জাহেদ

নিয়মিত লেখক
আবু নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান
রহমান মোখলেস
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
মারজান আহমদ চৌধুরী

সহ-সম্পাদক
মুহাম্মাদ উসমান গণি
মিফতাহুল ইসলাম তালহা

সার্কুলেশন ম্যানেজার
এস এম মনোয়ার হোসেন

কম্পোজ ও প্রচ্ছদ ডিজাইন
পরওয়ানা গ্রাফিক্স

যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা
ফুলতলী কমপ্লেক্স
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
মোবাইল: ০১৭৯৩ ৮৭৭৭৮৮

সিলেট অফিস
পরওয়ানা ভবন
৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯ ৬২৯০৯০

parwanabd@gmail.com
www.parwana.net

মূল্য: ২৫ টাকা

সূচিপত্র

তাফসীরুল কুরআন
আত-তানভীর/ আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্ (র.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ০৩

শারহুল হাদীস
কল্যাণকামিতাই ধর্ম/ মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান ০৫

সাহাবা
আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)/ মাওলানা মো. নজমুদ্দীন চৌধুরী ০৭

তাসাওউফ
খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান/ মাওলানা মো. গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ১০

প্রবন্ধ
ষোলই ডিসেম্বরের শিক্ষা/ অধ্যাপক আবদুল গফুর ১২
ওয়ায মাহফিল: সুন্নাহ পদ্ধতি ও কয়েকটি প্রস্তাবনা/ মারজান আহমদ চৌধুরী ১৪
সন্তানের অধিকার/ মো. জুয়েল আহমদ ১৭
ঘুমানোর পূর্বাপর সুন্নাতে নববী ﷺ /মোহাম্মদ আখতার হোসাইন ২০

আকাঈদ
কালাম শাস্ত্রের উদ্ভাবন ও ক্রমবিকাশ: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা/ আব্দুল্লাহ জারীর ২২

আন্তর্জাতিক
কোন পথে আজ লিবিয়া ও ইরাক?/ রহমান মুখলেস ২৬

আলোকপাত
প্রজ্ঞাতেই নেতৃত্বের সাফল্য/ আফতাব চৌধুরী ২৯
র‍্যাগ ডে: নতুন অপসংস্কৃতির আমদানী/ আহসান উদ্দিন ৩০

সফরনামা
ভারত সফরে কয়েকদিন/ রূহুল আমীন খান ৩৬

মসনবীর গল্প
ধর্মীয় অনৈক্যের বিচিত্র চক্রান্ত জাল/ ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী ৩৯

শ্বাশ্বত বাণী
ফুতুহুল গাইব/ মূল: গাউসুল আযম মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদির জিলানী (র.)
অনুবাদ: আব্দুল্লাহ যোবায়ের ৪২

খাতুন
ছাত্রী জীবনে শালীনতা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ/ অধ্যাপিকা হাফিজা খাতুন ৪৩

নিয়মিত
এই মাসে এই চাঁদে ৪৫
জীবন জিজ্ঞাসা ৪৭
এক নজরে গত মাস ৫১
জানার আছে অনেক কিছু ৫৫
বিজ্ঞান ৫৫
কবিতা ৫৬
আবাবীল ফৌজ ৫৭
সম্পাদকীয় ০২

সম্পাদক কর্তৃক বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত এবং সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।

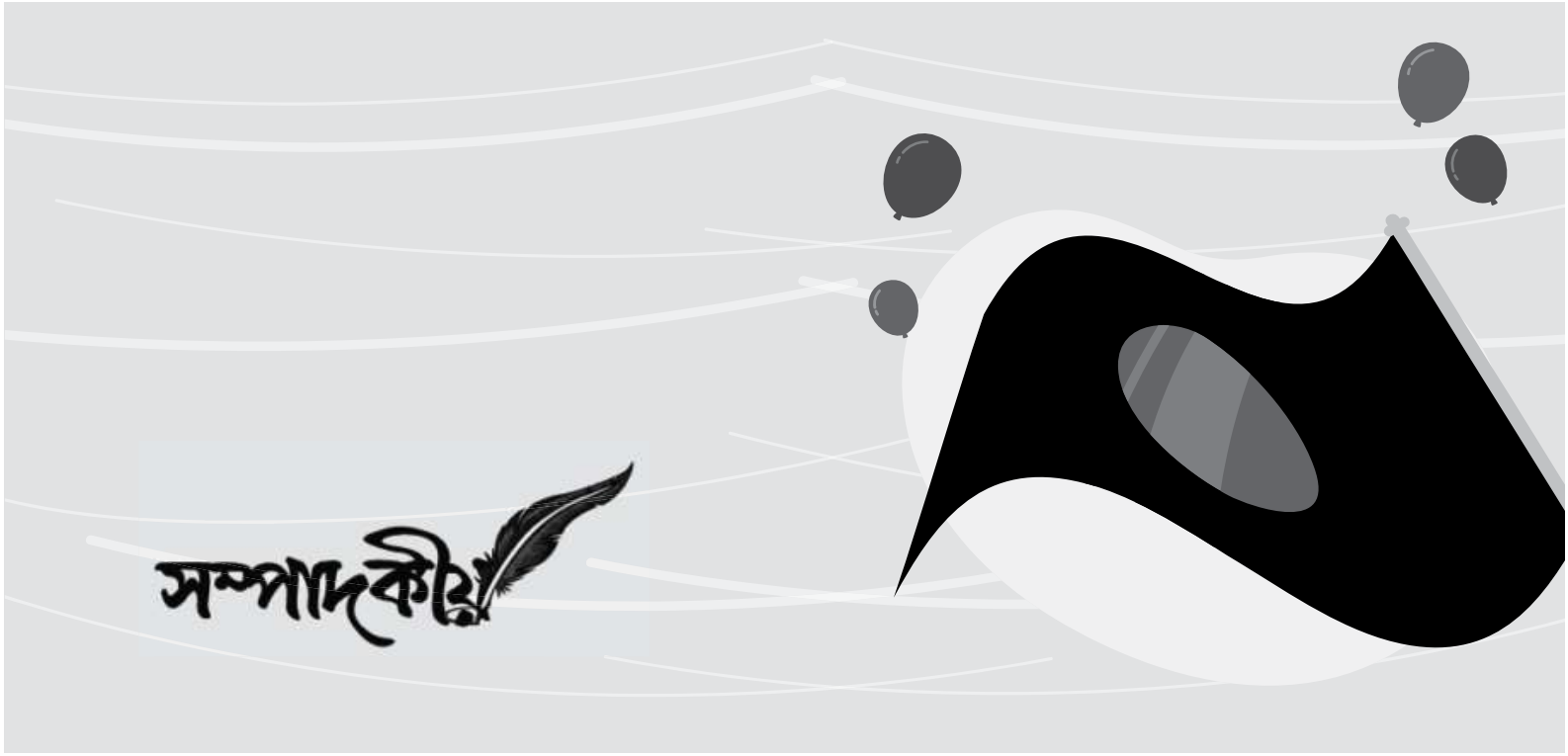

نحمده ونصلى على رسوله الكريم– اما بعد

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। বিশ্বের বুকে এদিনই অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করেছে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ। আমরা পেয়েছি আমাদের নিজস্ব একটি ভূমি, একটি রাষ্ট্র, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ। স্বাধীনতার এই মাসে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সেই সব বীর জনতার প্রতি, যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের এই অর্জন।

আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি ঠিকই, কিন্তু স্বাধীনতার সুফল আজও পুরোপুরি ভোগ করতে পারি নি। সময়ে অসময়ে নানা অপশক্তির খবরদারি আজও সহ্য করতে হচ্ছে আমাদের। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে এ দেশের গোড়াপত্তন হলেও ইসলাম আজও এখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি; বরং সময়ে সময়ে এখানে ইসলামী আদর্শ-বিশ্বাসের মর্মমূলে কুঠারাঘাত করার দুঃসাহস দেখিয়েছে পশ্চিমাদের পদলেহনকারী 'বুদ্ধিজীবী' নামের কিছু পরজীবী। তারা এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিশ্বাস-সংস্কৃতি, আচার-আচরণকে উপেক্ষা করে দেশকে কখনো পশ্চিমা সংস্কৃতিতে, কখনো ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতিতে ভরে তুলতে চেয়েছে। এ দেশের শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষের ধর্ম ইসলাম, অথচ ইসলামী সংস্কৃতি তাদের চোখের বালি। আপন অস্তিত্বের সাথে প্রতারণাকারী এ পরজীবীদের বোধোদয় কখন ঘটবে- স্বাধীনতার ৫০তম বছরেও এ জিজ্ঞাসা জাতিকে ভাবিয়ে তুলে।

অপশক্তির খবরদারি থেকে দেশ মুক্ত হোক, সকল ক্ষেত্রে অর্জিত হোক স্বয়ংসম্পূর্ণতা। বিজয় দিবসে মহান আল্লাহর দরবারে আমরা এই কামনা করি।

> *"অপশক্তির খবরদারি থেকে দেশ মুক্ত হোক, সকল ক্ষেত্রে অর্জিত হোক স্বয়ংসম্পূর্ণতা। বিজয় দিবসে মহান আল্লাহর দরবারে আমরা এই কামনা করি।"*

.....

আলহামদুলিল্লাহ! মাসিক পরওয়ানা আরো একটি বৎসর পূর্ণ করলো। ১৯৯২ সাল থেকে যাত্রা শুরু করা মাসিক পত্রিকাটি বিশ্বময় বাংলাভাষী পাঠকের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলো প্রথম থেকেই।

প্রায় ২৮ বৎসর গৌরবময় পথচলার পরে ২০২১ সালের প্রথম থেকে বর্তমান সম্পাদনা পরিষদের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। অতীতের দেখানো পথে বর্তমানের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন আঙ্গিকে পূর্ণ এক বছর সকল সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আমরা কতটুকু সফল হয়েছি তা সম্মানিত পাঠকবৃন্দ মূল্যায়ন করবেন। তবে বিশ্বময় পাঠকের ব্যাপক সাড়া আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে, এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে। অনলাইনের এই সময়ে কোনো কোনো সংখ্যার একাধিক মুদ্রণ অনেকের মতো আমাদেরকেও বিস্মিত ও অভিভূত করেছে। যতটুকু সুন্দর হয়েছে তার কৃতিত্ব পৃষ্ঠপোষক, লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভাকাঙ্খী এবং সম্পাদনা ও বিন্যাসের সাথে সম্পৃক্ত কলাকুশলিদের। ইন শা আল্লাহ, সকলের সহযোগিতা নিয়ে উত্তরোত্তর আমাদের আরো ভালো করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। সবাইকে বর্ষপূর্তির শুভেচ্ছা।

আত্ তানভীর

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী
ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদ
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ– وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ– قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ– قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ.

অনুবাদ: আমরাইতো আপনার সপ্রশংসা স্তুতি ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন। তারপর তা সমুদয় ফিরিশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বলল, আপনি মহান পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়। তিনি বললেন, হে আদম! তাদেরকে এগুলোর নাম বলে দাও। তিনি তাদেরকে এ সকল নাম বলে দিলে তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ আমি তাও জানি। (সূরা বাকারাহ; আয়াত ৩০-৩৩)

তাফসীর:

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের অর্থ আমরা আপনার প্রশংসার মাধ্যমে আপনার মহত্ত্ব প্রকাশ করছি, শুকরিয়া আদায় করছি। আরবদের পরিভাষায় আল্লাহর প্রতিটি স্মরণই হচ্ছে তাসবীহ ও সালাত। আর تقديس এর অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা ও মহত্ত্ব। (তাফসীরে তাবারী, ১/৫০২)

قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, আমি ইবলীসের গোপন কথা, যাতে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী এবং অহংকার রয়েছে তা জানি, যা তোমরা জানো না।

হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, এ বিষয়টি আল্লাহ তাআলার ইলমে ছিল যে, যেই খলীফার কথা তিনি ফিরিশতাদের বলেছেন- তাদের মধ্যে রয়েছেন নবী-রাসূল, নেক বান্দাহগণ এবং জান্নাতীগণ (তাবারী, ১/৫১০)। আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদেরকে অবহিত করেন যে, আমি জানি এ খলীফাদের উত্তরসূরী হতে ফাসাদ ও রক্তপাত প্রকাশ পাবে। ফিরিশতাগণ বলেন, আমাদেরকে বাদ দিয়ে কি আপনি যমীনে আপনার এমন প্রতিনিধি সৃষ্টি করবেন, যাদের বংশ হতে অবাধ্য প্রজন্মের বিস্তৃতি ঘটবে, নাকি আপনি আমাদের মাঝ থেকেই প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন? আমরা তো আপনার মহত্ত্ব, গুণগান করছি আপনার নির্দেশ পালনার্থে নামায আদায় করছি। আপনার অনুসরণ করছি। আপনার নাফরমানী করছি না। ফিরিশতাদের এ সব কিছু বলার কারণ হলো ইবলীসের অহংকার সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান ছিল না। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা পরস্পর যা বলছ, এগুলো ছাড়াও আমি এমন কিছু জানি যা তোমরা জান না। (তাবারী, ১/৫১১)

وَعَلَّمَ آدَمَ

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র.) হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা হযরত আযরাঈল (আ.) কে মাটি সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি যমীনের উপরিভাগ হতে মিঠা মাটি ও লবণাক্ত মাটি আহরণ করেন এবং সে মাটি হতে আদম (আ.) কে সৃষ্টি করেন। এজন্য আদম (আ.) কে আদম নামে অভিহিত করেন। যেহেতু যমীনের উপরিভাগকে اَدَمَ বলা হয়। আর যমীনের উপরিভাগের মাটি দিয়েই আদম (আ.) কে সৃষ্টি করা হয়। (আত তারীখ ইবন আসাকির, ৭/৩৮০; তাবারী, ১/৫১১)

হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (র.) বলেন, হযরত আদম (আ.) কে ادم। الارض। তথা জমির উপরিভাগে মাটি হতে পয়দা করার কারণেই আদম নামে আখ্যায়িত করা হয়। (তাবাকাত ইবন সাদ, ১/২৬; তাফসীরে তাবারী, ১/৫১২)

হযরত ইবন মাসউদসহ আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি জামাআত হতে বর্ণিত আছে, হযরত আদম (আ.) এর মাটি নেওয়ার জন্য যখন আল্লাহ তাআলা আযরাঈল (আ.) কে প্রেরণ করেন তখন তিনি পুরো যমীন হতে মাটি নিয়ে তা মিশ্রিত করেন। এক জায়গা হতে না নিয়ে বিভিন্ন জায়গা হতে লাল, সাদা ও কালোসহ বিভিন্ন রং এর মাটি নিয়ে

তা মিশ্রিত করে নেন। এ জন্যই আদম সন্তান বিভিন্ন রং এর হয়ে থাকে। আর আদম (আ.) কে এজন্য আদম নামকরণ করা হয়েছে, কেননা মাটির উপরের অংশ তথা ادیم الارض হতে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (তাফসীরে তাবারী, ১/৫১২)

অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে-

عن أبي موسى الأشعرى ﷺ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّ اللهَ خلَقَ آدَمَ من قَبضةٍ قَبَضَها من جميعِ الأرضِ، فجاءَ بنو آدَمَ على قَدْرِ الأرضِ: جاء منهم الأحمرُ، والأبيضُ، والأسودُ، وبينَ ذلك، والسَّهلُ، والحَزْنُ، والخبيثُ، والطَّيِّبُ.

-হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.) কে এক মুষ্টি মাটি হতে সৃষ্টি করেন। এ এক মুষ্টি মাটি পৃথিবীর সব জায়গার মাটি থেকে সংগ্রহ করা হয়। সেই অনুযায়ী আদম সন্তান লাল, কালো, সাদা রং এর হয়। তাছাড়া মাটির বৈশিষ্ট্য হিসেবে নম্র, চিন্তাশীল, খারাপ ও ভালো স্বভাবের হয়ে থাকে। (তাবারী, ১/৫১৩)

আদম শব্দটি ادمه থেকে فعل কে রূপান্তরিত করে اسم বা বিশেষ্য বানানো হয়েছে।

الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

(সবকিছুর নাম)। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে- তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.) কে সবকিছুর নাম শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এমন সব জিনিস যার সাথে মানুষ পরিচিত। যেমন মানুষ, জীব-জন্তু, যমীন, সমুদ্র, পাহাড়, গাধা এবং এ জাতীয় অনেক কিছু। (তাফসীরে তাবারী, ১/৫১৪)

হযরত মুজাহিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার বাণী وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا– الخ এর অর্থ হবে আল্লাহ তাআলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সবকিছুর নাম আদম (আ.) কে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর থেকে আরো বর্ণিত আছে- আদম (আ.) কে কাকের নাম, গাধার নাম, কবুতরের নাম এবং প্রত্যেক জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। (তাবারী, ১/৫১৫)

হযরত সাঈদ বিন যুবাইর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁকে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কিছুর নাম শিক্ষা দেন। এমন কি ভেড়া, গরু, ছাগল এর নাম পর্যন্ত শিক্ষা দেন। (প্রাগুক্ত)

وعن ابن عباس ﷺ قال علمه اسم القصعة والفسوة والفسية

وعنه ايضا قال علمه اسم كل شيئ حتى الهنة والهنية والفسوة الضرطة.

-হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা আদম (আ.) কে সবকিছুর নাম শিখিয়েছিলেন- চামচ, মুহূর্ত, কাল এমনকি পশ্চাদ বায়ুর নাম পর্যন্ত শিখিয়েছিলেন। (প্রাগুক্ত)

وعن الحسن وقتادة قالا علمه كل شيئ هذه الخيل وهذه البغال والابل والجن والوحش وجعل يسمى كل شيئ باسمه.

-হযরত হাসান ও কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.) কে প্রত্যেক জিনিসের নাম শিখিয়ে দিয়েছিলেন, কোন জিনিসকে কোন নামে অভিহিত করা হবে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন ইহা হলো ঘোড়া, ইহা খচ্ছর, উট, জিন, জানোয়ার এভাবে সবকিছুর নাম ধরে ধরে শিক্ষা দিয়েছেন। (তাবারী, ১/৫১৭)

অন্য একদল মুফাসসিরীনে কিরাম বলেন, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ এর অর্থ হচ্ছে, ফিরিশতাদের নাম। অন্য একদল মুফাসসীর বলেন, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.) কে তার সকল বংশধরের নাম শিখিয়ে দিয়েছিলেন। (প্রাগুক্ত)

অবশেষে এ কথায় উপনীত হওয়া যায় যে, হযরত ইবন আব্বাস (রা.) এর বর্ণনাই প্রণিধানযোগ্য। কারণ অন্যান্য সকল বর্ণনা এর অন্তর্ভুক্ত।

ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ

(এরপর আল্লাহ তাআলা ঐ সব জিনিস ফিরিশতাদের সম্মুখে পেশ করেন।) হযরত হাসান (র.) ও হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, হযরত আদম (আ.) কে প্রত্যেক জিনিসের নাম শিখিয়েছিলেন তা এ রকম: هذه الخيل এটি ঘোড়া, هذه البغال এটি খচ্ছর। এভাবে প্রত্যেক জিনিসের নাম পৃথক পৃথক করে শিখিয়েছিলেন ও পৃথক পৃথক এক একটি দলকে তার কাছে পেশ করেছিলেন। (তাবারী, ১/৫২১)

فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ

-অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা এসব জিনিসের নাম বলো, যা আদম (আ.) বর্ণনা করেছেন।

إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

(তোমরা যদি তোমাদের যুক্তিতে সত্য হও।) অর্থাৎ তোমরা যদি এসব জিনিসের নাম জানো, তাহলে আমি যমীনে খলীফা বা প্রতিনিধি নিয়োগ করব না। অথবা তোমরা যদি এ কথায় সত্য হও যে, আমি তোমাদেরকে যমীনে খলীফা নিয়োগ করলে তোমরা আমার তাসবীহ পড়বে, পবিত্রতা বর্ণনা করবে, পক্ষান্তরে তোমরা ছাড়া অন্য কাউকে খলীফা নিয়োগ করলে তারা এবং তাদের সন্তানরা নাফরমানী করবে, ঝগড়া করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে।

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

-ফিরিশতারা বললেন, আল্লাহ আপনি পবিত্র। আপনি যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোনো ইলম নেই। আপনি জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আপনি যা কিছু বিরাজমান এবং যা কিছু ভবিষ্যতে হবে সবকিছুই আপনি জানেন। অদৃশ্য বিষয়ে শুধু আপনি জ্ঞাত, আপনার সৃষ্টির অন্য কেউই তা জানে না। (তাবারী, ১/৫২৯)

قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ.

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম! ফিরিশতাদেরকে জানিয়ে দাও এসব জিনিসের নাম। যখন হযরত আদম (আ.) তাদেরকে এসব জিনিসের নাম বলে দিলেন, তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি আসমান এবং যমীনের অদৃশ্য বিষয়ে আমি জ্ঞাত, এমনকি তোমরা যা প্রকাশ করো তাও আমি জানি আর যা গোপন করো তাও আমি জানি।

مَا تُبْدُونَ দ্বারা ফিরিশতাদের কথার প্রতি ইশারা করেন। ফিরিশতারা প্রকাশ্যে বলেছিলেন, أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا। আর مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ দ্বারা ইবলীসের অহংকার ও গৌরব এর প্রতি ইশারা করেছেন। (তাবারী, ১/৫৩১)

অথবা, এর অর্থ হবে এরূপ- হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করার পর এ অদ্ভুত সৃষ্টি দেখে তারা পরস্পরে বলেছিল, আল্লাহ তাআলা এ সৃষ্টি দিয়ে কী করবেন? আমরা এ সৃষ্টি হতে বেশি সম্মানিত ও বেশি জ্ঞানী। এসব কথা ফিরিশতাদের মধ্যে গোপন ছিল। হয়তো এসব কথার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন (তাবারী, ১/৫৩২)। তবে এসব রিওয়ায়াতের মধ্যে প্রথম রিওয়ায়াতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, কারণ এর বর্ণনাকারী হচ্ছেন হযরত ইবন আব্বাস (রা.)। এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন ইমাম তাবারী। (তাফসীরে তাবারী, ১/৫৩৩)

দ্বীনের জন্য জিহাদ

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوْا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ؛ فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى". (رواه البخاري، ومسلم)

অনুবাদঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি মানুষদের সাথে জিহাদের জন্য আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল আর নামায কায়িম করে ও যাকাত দেয়। যখন তারা এরূপ করবে তখন আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে। তবে ইসলামের কোনো হক থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। আর তাদের হিসাব-নিকাশের ভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসের ব্যাখ্যা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে ইসলামের তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন। এগুলো হলো- ১. সুদৃঢ় ঈমান তথা একথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল ২. নামায কায়িম করা ৩. যাকাত প্রদান করা। এ তিনটি বিষয় কেউ পালন না করলে তার সাথে জিহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদিষ্ট হয়েছেন মর্মে তিনি বাণী প্রদান করেছেন। এখানে আদেশদাতা কে এর উল্লেখ না থাকলেও তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, তিনি হলেন আল্লাহ। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আদেশ দানকারী আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। অতএব, হাদীসের মর্মার্থ হবে, আল্লাহর নির্দেশ হলো, কেউ ঈমান না আনলে এবং নামায কায়িম ও যাকাত প্রদান না করলে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে। আর যে এগুলো (অর্থাৎ ঈমান আনয়ন এবং নামায ও যাকাত আদায়) করবে সে আপন জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে ইসলামের কোনো হক থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। আর তার অন্তরে যা রয়েছে এর হিসাব-নিকাশের ভার আল্লাহর উপর।

এ হাদীসে যে জিহাদের কথা বলা হয়েছে এর মূল উদ্দেশ্য হলো, ঈমানের প্রতি আহবান এবং আল্লাহর কালিমা ও দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা জিহাদ বলে গণ্য হবে। আর কিতাল বা সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রে শরীআতের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। এর দায়িত্ব কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়; বরং মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান বা খলীফা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। আবার কোনো অমুসলিম জনগোষ্ঠীকে সুস্পষ্টরূপে ইসলামের প্রতি আহবান ও সতর্ক করা ব্যতিরেকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না। অমুসলিমগণ জিযিয়া প্রদানে সম্মত হলে তারা জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে ফিকহের গ্রন্থাবলিতে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

এ হাদীস থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যেমন, আমল ঈমানের অংশ কি না? নামায না পড়লে কিংবা যাকাত না দিলে মুসলমানের বিরুদ্ধেও জিহাদ করা হবে কি না? ইত্যাদি। নিম্নে এসব বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

আমল ঈমানের অংশ কি না?

ঈমান না আনলে কারো বিরুদ্ধে জিহাদের বিষয় তো সুস্পষ্ট। কিন্তু নামায কায়িম না করলে কিংবা যাকাত না দিলে তার বিরুদ্ধেও জিহাদ ঘোষণা করা হবে মর্মে যে বর্ণনা এ হাদীসে রয়েছে তা থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, আমল ঈমানের অংশ। আমল যদি ঈমানের অংশ হয় তাহলে আমল পরিত্যাগের কারণে কোনো মুসলমান ব্যক্তি কি কাফির বলে গণ্য হবে? এ বিষয়ে ইখতিলাফ রয়েছে।

প্রথমত, আমল ঈমানের অংশ কি না এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ইমামগণের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে, ঈমান হলো, অন্তরের বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতির নাম। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ (র.) সহ অধিকাংশ ইমামগণের মতে, ঈমান হলো, আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও মৌলিক বিষয়সমূহ কাজে বাস্তবায়নের নাম। এখানে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর সংজ্ঞার মধ্যে 'আমল' অন্তর্ভুক্ত নেই। আবার অন্যান্য ইমামগণের সংজ্ঞার মধ্যে 'আমল' অন্তর্ভুক্ত আছে।

দ্বিতীয়ত, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর সংজ্ঞার মধ্যে 'আমল' অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও তিনি একথা বলেন না যে, আমল না করলে কোনো অসুবিধা নেই, যেমন মুরজিয়ারা বলে থাকে। আবার অন্যান্য ইমামগণের সংজ্ঞার মধ্যে 'আমল' অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তারা একথা বলেন না যে, আমল না করলে ঈমান থাকবে না, যেমন খারিজীরা বলে থাকে। সুতরাং উভয় সংজ্ঞার মধ্যে বাহ্যত পার্থক্য থাকলেও মূল বিশ্বাসে ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য ইমামগণের মধ্যে কোনো ইখতিলাফ নেই। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকের মতে, আমল পরিত্যাগের কারণে কোনো মুসলিম ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হবে না। এটিই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত আকীদা।

উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী (র.) তদীয় সহীহ বুখারী এর মধ্যে কিতাবুল ঈমানে فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم (অতঃপর যদি তাঁরা তাওবাহ করে, নামায কায়িম করে এবং যাকাত দেয় তবে তাঁদের পথ ছেড়ে দাও) শীর্ষক পরিচ্ছেদে এ হাদীসটি এনেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হলো মুরজিয়াদের জবাবে একথা প্রমাণ করা যে, আমল ঈমানের অংশ। কিন্তু তিনি আমলকে ঈমানের অংশ বললেও আমল পরিত্যাগকারীকে কাফির বলেন না। কিন্তু খারিজীরা আমলকে ঈমানের অংশ বলে আবার আমল পরিত্যাগকারীকে কাফিরও বলে থাকে।

হাদীসে কাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে?

ইবন দাকীক আল ঈদ (র.) বলেন, ইমাম খাত্তাবী (র.) সহ অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেছেন, হাদীসেَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ -"আমি মানুষদের সাথে জিহাদের জন্য আদিষ্ট হয়েছি" এখানে মানুষ বলতে মূর্তিপুজারী, আরবের কাফির-মুশরিক ও অন্যান্যদের বুঝানো হয়েছে, যারা ঈমান আনেনি। যারা আহলে কিতাব এবং যারা তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদান করে তারা এখানে উদ্দেশ্য নয়। (ইবন দাকীক আল ঈদ, শারহুল আরবাঈন, পৃষ্ঠা ৩৬)

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে, এখানে যারা ঈমান আনেনি এমন অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বলা হয়েছে। এ জিহাদ

মূলত ঈমানের প্রতি আহবান ও আল্লাহর কালিমাকে বিজয়ী করার লক্ষ্যেই পরিগণিত হবে। নামায, যাকাত ও অন্যান্য বাহ্যিক আমলের মাধ্যমে যেহেতু ঈমানের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে সেহেতু ঈমানের পাশাপাশি এ দুটি বিষয়ের কথা এখানে বলা হয়েছে। বস্তুত এখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বলা হয়নি। তবে ফরয আমল তথা নামায ও যাকাত ইত্যাদি যে আদায় করে না তার ব্যাপারে এখানে ধমক রয়েছে।

অবশ্য, আল্লামা ইবন হাজার আল হাইতামী (র.) ইমাম খাত্তাবী (র.) এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, ইবন উমর (রা.) বর্ণিত এ হাদীস দ্বারা নামায ও যাকাত পরিত্যাগকারীও উদ্দেশ্য, যদিও তারা মুসলমান হয়। কেননা হাদীসটি এটিই প্রমাণ করে। (আল ফাতহুল মুবীন, পৃষ্ঠা ২৬০)

হাদীসটি বাহ্যিক অর্থে মুসলমানদের ক্ষেত্রে গ্রহণ করলে তা নামায ও যাকাত তথা ফরয আমল অস্বীকারকারীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে। কেননা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ফরয ইবাদত, যা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, তা অস্বীকার করা কুফুরী। হযরত আবূ বকর (রা.) যাকাত অস্বীকারকারী এ ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন, যা 'রিদ্দার যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

ঈমানের জন্য শুধু তাওহীদের সাক্ষ্যই কি যথেষ্ট?

ঈমানের জন্য শুধু তাওহীদের সাক্ষ্যই যথেষ্ট নয়। বরং সাথে সাথে হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর রিসালাতের সাক্ষ্যও প্রদান করতে হবে। যে সকল হাদীসে রয়েছে مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ -'যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' সে সকল হাদীসে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাথে মূলত 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর সাক্ষ্যও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে গণ্য হবে। কেননা, হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ -'তোমরা কি জানো, এক আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ কী?' সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ -'এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।' (সহীহ বুখারী, হাদীস-৫৩)

ইমাম নববী (র.) বলেছেন, কাফির ব্যক্তি প্রথম তার ঈমান প্রকাশকালে 'আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অথবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলবে। প্রথমে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললে এ কথার কারণে তাকে হত্যা থেকে বিরত থাকতে হবে। কাফির ব্যক্তি কখনো হত্যা থেকে বাঁচার জন্যও এটি বলতে পারে। তখন তার আমল পর্যবেক্ষণ করা হবে। (ইমাম নববী (র.), শারহুল আরবাঈন, পৃষ্ঠা ১৭১)

নামায ও যাকাতকে ঈমানের সাথে সংযুক্ত করার তাৎপর্য

হাদীসে নিরাপত্তা লাভের ক্ষেত্রে ঈমানের সাথে বিশেষভাবে নামায ও যাকাতকে যুক্ত করা হয়েছে। মূলত এ দুটিকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে সকল শরঈ বিধি-বিধান গ্রহণের আবশ্যকতার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ ঈমানের সাথে সাথে শরঈ অন্যান্য সকল বিধি-বিধানও গ্রহণ করতে হবে।

ইমাম নববী (র.) বলেন, উলামায়ে কিরাম বলেছেন, وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ (আর নামায কায়িম করে ও যাকাত দেয়) এ অংশটি সকল ইবাদত আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করার প্রতি ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ, সে এ বিশ্বাস রাখবে যে, শরঈ সকল হুকুম পালনের জন্য সে আদিষ্ট এবং সে কোনো শরঈ হুকুমের বাইরে যাবে না। (শারহুল আরবাঈন, পৃষ্ঠা ১৭৩)

ইমাম নববী (র.) আরো বলেন, একদল উলামায়ে কিরাম বলেছেন, "নামায কায়িম করবে ও যাকাত প্রদান করবে" এর অর্থ হলো, এগুলোকে আবশ্যকরূপে গ্রহণ করবে। অর্থাৎ প্রথমে একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। এরপর শরীআতের সকল বিধি-বিধানকে গ্রহণ করবে। এগুলোর মধ্যে আল্লাহর সবচেয়ে বড় হক বা পাওনার মধ্যে শরীর সংশ্লিষ্ট হলো সালাত এবং অর্থ সংশ্লিষ্ট হলো যাকাত। (ঈমানের পাশাপাশি) এগুলোকে গ্রহণ করার মানে হলো, সে আকীদা-বিশ্বাস ও শরঈ জীবনাচরণ উভয় দিকেই (ইসলামে) প্রবেশ করলো। (প্রাগুক্ত)

শরঈ দণ্ড কি মওকুফ হবে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ -'যখন তারা এরূপ করবে' অর্থাৎ এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল আর নামায কায়িম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে তখন عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ -'তারা আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে ইসলামের কোনো হক থাকলে সেটি ব্যতীত।' অর্থাৎ ঈমান আনার পর তারা যদি দণ্ডলাভের উপযোগী কোনো অপরাধ করে তবে শরঈ বিধান অনুসারে দণ্ডপ্রাপ্ত হবে। যেমন, মানুষ হত্যার শাস্তিস্বরূপ হত্যা (কিসাস), বিবাহিত যিনাকারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা (রজম), চুরির অপরাধে হাত কাটা ইত্যাদি। তবে ঈমান আনার পূর্বেকার গুনাহ ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ -ইসলাম এর পূর্বের সকল অপরাধ মিটিয়ে দেয়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৩৬)

বিচার হবে বাহ্যিকতার ভিত্তিতে

কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয় এটি বাহ্যিক অবস্থার বিচারে নির্ণিত হবে। যদি কোনো ব্যক্তি প্রকাশ্যে ঈমানের সাক্ষ্য দেয়, শরঈ বিধি-বিধান মান্য করে তাহলে বাহ্যিক অবস্থার বিচারে তাকে মুসলমান হিসাবে গণ্য করা হবে। যদি সে অন্তরে কুফরী বা নিফাক গোপন রাখে তাহলে তার এ অবস্থা আল্লাহর উপর সোপর্দ হবে আর বাহ্যিকভাবে মুসলমান হিসাবে জান-মালের নিরাপত্তা সে লাভ করবে। যে মুখে ঈমান প্রকাশ করে এ ধরনের ব্যক্তিকে হত্যার বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ অপছন্দ করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, হযরত উসামা বিন যায়িদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের 'হুরাকাহ' শাখার বিরুদ্ধে পাঠালেন। আমরা ভোরে তাদের নিকট গেলাম এবং তাদের আক্রমণ করলাম। তিনি বলেন, আমি ও জনৈক আনসারী তাদের এক ব্যক্তিকে পেলাম। যখন আমরা তাকে ধাওয়া করলাম তখন সে বলে উঠলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনি (উসামা) বলেন, তখন আনসারী ব্যক্তি তাকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকলেন কিন্তু আমি তাকে আমার বর্শা দ্বারা আঘাত করে হত্যা করে ফেললাম। তিনি (উসামা) বলেন, যখন আমরা মদীনায় পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এ খবর গেলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে উসামা! সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও তুমি কি তাকে হত্যা করলে? উসামা বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ, সে তো বাঁচার জন্য তা বলেছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও তুমি কি তাকে হত্যা করলে? হযরত উসামা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বার বার এটি বলতে লাগলেন। এমনকি আমি আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলাম, হায়! যদি আমি ঐ দিনের পূর্বে মুসলমান না হতাম। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৬৪০৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৮০)

এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয়, কেউ যদি বাহ্যিকভাবে ঈমান প্রকাশ করে তবে বাহ্যিকতার ভিত্তিতে তাকে মুসলমান গণ্য করতে হবে। অন্তরে কুফরী গোপন থাকলে সেটি আল্লাহই বিচার করবেন। এ প্রসঙ্গেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى -তাদের হিসাব-নিকাশের ভার আল্লাহর উপর।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)

মাওলানা মো. নজমুদ্দীন চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

হযরত আলী (রা.) সর্বপ্রথম খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী। খারিজীদের আলোচনা, তাদের সম্বন্ধে রাসূল ﷺ এর ভবিষ্যদ্বাণী ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাবের হত্যার কথা সংক্ষেপে ইতিপূর্বে লিখা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাব হত্যাকাণ্ডের পূর্ণ বিবরণ হলো: একদিন আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাব (রা.) তাঁর স্ত্রীকে সাথে নিয়ে গাধায় চড়ে খারিজীদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। খারিজীরা তাঁকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন আমি আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাব, রাসূল ﷺ এর সাহাবী। খারিজী প্রশ্ন করল তুমি কি ভয় পেয়েছ? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। তারা বলল, ভয়ের কিছু নেই।

খারিজী: আবূ বকর ও উমর সম্বন্ধে তোমার ধারণা কী?

আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাব আবূ বকর (রা.) ও উমর (রা.) এর প্রশংসা করলেন।

খারিজী: আচ্ছা উসমান (রা.) এর আমলের প্রাথমিক অবস্থা ও শেষ অবস্থা সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা?

আব্দুল্লাহ: তিনি (খিলাফতের) প্রথম অবস্থায়ও সত্যের উপর, শেষ আমলেও সত্যের উপর ছিলেন।

খারিজী: এখন বল আলী সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা? তাহকীম (সালিশমানা) এর আগে তিনি কেমন ছিলেন এবং তাহকীমের পর তাঁর ধর্মীয় অবস্থা কেমন।

আব্দুল্লাহ: তিনিতো তোমাদের চাইতে আল্লাহকে ভালো জানেন। তিনি তোমাদের চাইতে অধিক খোদাভীরু, তোমাদের চাইতে সূক্ষ্ম বিবেচক।

খারিজী: তুমি তো তোমার ইচ্ছার দাস। প্রসিদ্ধ লোকদের নাম দেখে তাদেরকে ভালোবাসো। এদের কার্যকলাপ দেখ না। আমরা তোমাকে খুব মন্দভাবে হত্যা করব।

তারপর খারিজীগণ আব্দুল্লাহ এবং তাঁর স্ত্রীকে ধরে নিয়ে সামনে চলতে লাগল। পথে এক খেজুর গাছের নীচে থামল। তখন গাছ থেকে একটি খেজুর পড়ল। একজন খারিজী খেজুরটি মুখে পুরে নিল। তখন অন্য খারিজীরা বলতে লাগল, তুমি খেজুরের মূল্য পরিশোধ অথবা মালিকের অনুমতি ছাড়া কিভাবে খেজুরটি খেয়ে ফেলছ? একথা শুনে খারিজীটি থু করে মুখ থেকে খেজুর ফেলে দিল এবং এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে নিজের ডানহাত তরবারি দিয়ে কেটে ফেলল। যাওয়ার পথে এক যিম্মীর একটি শুকরকে এক খারিজী হত্যা করে ফেলল। তখন অন্য খারিজীরা বলতে লাগল এটি তো যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা (অর্থাৎ শুকর হত্যা)। তখন ঘাতক খারিজী শুকরের মালিকের কাছে গিয়ে তার নিকট ক্ষমা চাইলো এবং সন্তুষ্ট করল।

আব্দুল্লাহ যখন তাদের এসব কাণ্ড দেখলেন তখন বলতে লাগলেন তোমরা যখন এমন সাচ্চা লোক তখন তো আমার ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমি একজন মুসলমান এবং আমি ইসলামে কোনো বিদআতও সৃষ্টি করিনি।

এরপর খারিজীগণ তাঁকে ধরে মাটিতে ফেলে দিল এবং জবাই করে ফেলল। আব্দুল্লাহর স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন এবং সন্তান জন্মের সময়ও আসন্ন ছিল। খারিজীরা তাকে ধরলে তিনি বললেন, আমি তো একজন মহিলা। তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না? খারিজীরা কোনো কথায় কর্ণপাত করল না এবং আব্দুল্লাহর স্ত্রীর পেটে তরবারি দিয়ে বাচ্চাসহ কেটে ফেলল। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

খারিজীদের অমানবিক আচরণের সামান্য নমুনা উপরে উল্লেখিত বর্ণনায় পাওয়া গেল।

খারিজীগণ বাহ্যিকভাবে নামায, রোযা, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি বেশিই করত। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহর নবী ﷺ এর অনেক ভবিষ্যদ্বাণী সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে।

হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (র.) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে লিখেছেন,

عن عبد الرزاق فقال بن ذي الخويصرة التميمي وهو حرقوص بن زهير أصل الخوارج

-আব্দুর রাযযাক থেকে বর্ণিত যে, যুল খুওয়াইসিরার আসল নাম হারকূস বিন যুহাইর। সে ছিল খারিজী দলের মূল ব্যক্তি। (ফাতহুল বারী, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ১৯২)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন,

وقال الذهبي ذو الخويصرة القائل فقال يا رسول الله إعدل يقال هو حرقوص بن زهير رأس الخوارج قتل في الخوارج يوم النهر وفي تفسير الثعلبي بينا رسول الله يقسم غنائم هوازن جاءه ذو الخويصرة التميمي أصل الخوارج

-ইমাম যাহাবী বলেছেন, যুল খুওয়াইসিরা সেই ব্যক্তি যে বলেছিল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ইনসাফের সাথে কাজ করুন। কথিত আছে যে, সে হলো হারকূস বিন যুহাইর, খারিজীদের মূল ব্যক্তি। সে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে (হযরত আলী রা. এর সময়ে) নিহত হয়। তাফসীরে সা'লাবীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ যখন হাওয়াযিনের যুদ্ধলব্ধ মালামাল (জি'রানা নামক স্থানে) বণ্টন করছিলেন। তখন সেখানে যুল খুওয়াইসিরা আত তামিমী এসে হাযির হয়। সে ছিল খারিজী দলের প্রতিষ্ঠাতা। (বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ৬২)

খারিজীগণ সাংগঠনিকভাবে প্রকাশকালে এ স্লোগান দিয়েছিল: **لا حكم إلا لله** -'আল্লাহ ব্যতীত কেউ কোনো হুকুম করতে পারে না।'

খারিজীদের এ কর্মকাণ্ড হযরত আলী (রা.) যখন অবহিত হলেন তখন বললেন,

كلمة حق اريد بها باطل

-কথা সত্য কিন্তু এর উদ্দেশ্য খারাপ। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত)

খারিজীগণ মানুষকে সালিশ নিযুক্ত করার উপর ভয়ানক আপত্তি উত্থাপণ করে। এ বিষয়ে তারা হযরত আলী (রা.) কে (নাউযুবিল্লাহ) ইসলাম থেকে খারিজ পর্যন্ত বলেছিল। হযরত আলী (রা.) এ গোমরাহ দলটিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তাদের ভ্রান্ত আকীদার বিপরীতে অনেক দলীলাদি পেশ করেছেন। কিন্তু খারিজীগণ তাদের ভ্রান্ত আকীদার উপর অবিচল থেকে মুসলমানদের উপর যুলম নির্যাতন চালিয়ে যেতে থাকে।

খারিজীরা ইসলামের সুমহান নীতি, আদর্শ, মানবিকতা, জীবে দয়া, সহমর্মিতা ইত্যাদি সকল মহৎ গুণ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। তখন নিজেদের মনগড়া অধার্মিক আচরণ, মানবতা বিরোধী কার্যকলাপকে ইসলামের মোড়কে উপস্থাপন করার অপচেষ্টা করত। তাদের বাতিল মতবাদের অনুসরণকারী নয় এমন সকল মানুষকে মুশরিক ও ইসলাম থেকে খারিজ মনে করত। খারিজীরা দ্বীন ইসলামের নামে নতুন নতুন বিদআত প্রবর্তন করত। কুরআন হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা দিত। তারা নিজেদের জন্য মুসলমানদেরকে কতল করা ওয়াজিব বলে ঘোষণা করত। তাদের কতিপয় বিদআত এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. কাফিরদের সম্বন্ধে নাযিল হওয়া আয়াতসমূহ মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করা। وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللهِ وَقَالَ إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. (بخاري)

হযরত ইবন উমর (রা.) তাদেরকে (খারিজীদেরকে) আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি মনে করতেন এবং তিনি বলেছেন, তারা কাফিরদের সম্বন্ধে নাযিল হওয়া আয়াতসমূহকে মুমিনদের উপর আরোপ করত। (বুখারী, কিতাবুল ইসতিতাবাহ)

২. মুসলমানদের হত্যা করা আর মূর্তিপূজারীদের নিষ্কৃতি দেওয়া।

আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ. (بخاري)

-নিকৃষ্ট এ লোকটির (যুল খুয়াইসিরা) নসল থেকে এমন লোক বের হবে যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে দূরে সরে যাবে যেভাবে ধনুক থেকে তীর সরে যায়। এরা মুসলমানদের হত্যা করবে এবং মূর্তি পূজারীদের ছেড়ে দিবে। আমি যদি তাদেরকে পাই তবে কাওমে আদের মতো কতল করব। (বুখারী, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া)

কাফির সম্পর্কে নাযিল হওয়া আয়াতকে মুমিনের উপর আরোপ করার উদাহরণ হলো- وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ

-আর এমন লোক রয়েছে যার পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর সে সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন (ঝগড়াটে লোক)। (সূরা বাকারাহ; আয়াত ২০৪) এ আয়াতটির শানে নুযুল সম্বন্ধে ইবন কাসীর তাঁর তাফসীরে লিখেছেন,

قال السدي: نزلت في الأخنس بن شَرِيق الثقفي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك. وعن ابن عباس: أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خُبَيب وأصحابه الذين قتلوا بالرّجيع وعابُوهم، فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خُبَيب وأصحابه: "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ" وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم.

-সূদ্দী বলেন, আয়াতটি নাযিল হয়েছে আখনাস বিন শুরাইক সাকাফী সম্বন্ধে। সে রাসূল ﷺ এর কাছে আসলো এবং ইসলাম প্রকাশ করল। কিন্তু তার অন্তরে ছিল এর বিপরীত (বিশ্বাস)। ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াত এমন একটি দল মুনাফিক সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে, যারা রজির ঘটনায় শাহাদাত বরণকারী হযরত খুবাইব ও তাঁর সঙ্গীদের বিরূপ সমালোচনা করেছিল এবং শহীদদের নিন্দা করেছিল। তখন আল্লাহ পাক মুনাফিকদের নিন্দায় এ আয়াত নাযিল করেছেন। আর খুবাইব ও তাঁর সাথীদের প্রশংসায় নাযিল করেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ

-আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণির মানুষ আছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জীবনবাজি রাখে। (তাফসীরে ইবন কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৬-২৪৭)

এ আয়াতের শানে নুযুল উপরে ইবন কাসীর থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। যার অনুবাদ হলো এ আয়াতটি হযরত খুবাইব ও তাঁর সঙ্গীদের প্রশংসায় আল্লাহ পাক নাযিল করেছেন। ইবন কাসীর লিখেছেন এ আয়াতের হুকুম আম। অর্থাৎ যে মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবনবাজি রাখবে তার প্রশংসায় এ আয়াত প্রযোজ্য হবে। (তাফসীরে ইবন কাসীর)

তাই হিজরতের রাত্রে হযরত আলী (রা.) রাসূল ﷺ এর হুকুমে নবী ﷺ এর বিছানায় শয়ন করেছিলেন। ইহাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবনবাজি রাখার এক উদাহরণ।

কিন্তু খারিজীরা হযরত আলী (রা.) কে কাফির (নাউযুবিল্লাহ) বলেছিল এবং হযরত আলী (রা.) সম্বন্ধে তারা বলত যে, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ الخ

এ আয়াত হযরত আলী (রা.) এর নিন্দায় আল্লাহ পাক নাযিল করেছেন। এ আয়াত মুনাফিকদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। এর বর্ণনা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। খারিজীরা মুনাফিকের নিন্দায় নাযিলকৃত আয়াত হযরত আলী (রা.) এর উপর আরোপ করত। (নাউযুবিল্লাহ)

দ্বিতীয়ত: খারিজীরা বলেছিল, কুরআনের আয়াত 'মানুষের মাঝে এমন মানুষও আছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন বাজি রাখে।' এ আয়াতটি হযরত আলী (রা.) কে হত্যাকারী ইবন মুলজিমের প্রশংসায় নাযিল হয়েছে।

মোটকথা, খারিজীরা মুনাফিকের নিন্দায় নাযিলকৃত আয়াতকে হযরত আলী (রা.) এর উপর আরোপ করেছিল। আর মুমিনদের প্রশংসায় নাযিলকৃত আয়াতকে হযরত আলী (রা.) এর ঘাতকের প্রশংসায় আরোপ করেছিল।

খারিজীরা অনেকগুলো দলে বিভক্ত ছিল এবং তাদের মতবাদেও কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে সব দলের মতবাদই গোমরাহীর সীমারেখার ভিতরে আবর্তিত। নিম্নে তাদের কয়েকটি দলের মতবাদ খুব সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হলো।

১. আল মুহাকিমা: এরা হযরত আলী (রা.) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল যখন হযরত আলী (রা.) দুজন সালিশ মেনে নিয়েছিলেন। তারা কুফার উপকণ্ঠে হারুরা নামক স্থানে জমায়েত হয়েছিল। এ দলের শীর্ষস্থানীয় লোক আব্দুল্লাহ বিন কুওয়া, ইতাব বিন আওর, আব্দুল্লাহ বিন ওহাব রাসিবী, উরওয়া বিন যুরাইর, ইয়াযীদ বিন আবি আসিম এবং হরকূস বিন যুহাইর যে 'যু-সাদইয়া' নামে প্রসিদ্ধ। তারা সংখ্যায় বারো হাজার ছিল। তারা বলত আলী (রা.) মানুষকে হাকিম মেনে ভুল করেছেন। কারণ আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম হতে পারে না। এদের জবাবে

হযরত আলী (রা.) বলেছিলেন, কথা সত্য কিন্তু উদ্দেশ্য খারাপ।

তারা হযরত উসমান (রা.) ও উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং সিফফীনে অংশগ্রহণকারী সকলের বিরোধী ছিল। এদের সম্বন্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যতবাণী 'তোমাদের একজনের নামায তাদের নামাযের তুলনায়, তোমাদের একজনের রোযা তাদের রোযার তুলনায় নগণ্য মনে হবে। কিন্তু তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠের হাড়ের নীচে পৌঁছবে না। তারা সেই দল যাদের সম্পর্কে আল্লাহর নবী বলেছেন, 'এ লোকের নসল থেকে এমন লোক বের হবে যারা দ্বীন থেকে এমনভাবে দূরে সরে যাবে যেভাবে ধনুক থেকে তীর দূরে সরে যায়। এরা সেই দল যাদের প্রথম ব্যক্তি যুল খুওয়াইসিরা এবং শেষ ব্যক্তি 'যু-সাদইয়া'।

হযরত আলী (রা.) এদের বিরুদ্ধে নাহরাওয়ান নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ করেছেন। এ যুদ্ধে তাদের মাঝে যারা বেঁচেছিল তাদের সংখ্যা দশজনের কম এবং মুসলিম দলের যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের সংখ্যাও দশজনের চেয়ে কম।

২. আল আযারিকা: খারিজীদের আরো একটি দলের নাম 'আযারিকা' তারা আবূ রাশিদ নাফি বিন আযরাকের দল। এরা হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের খিলাফতকালে আহওয়াজ, কিরমাল ইত্যাদি প্রদেশ দখল করে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) এবং গভর্ণরদেরকে হত্যা করেছিল। নাফি'র সাথে খারিজীদের শীর্ষস্থানীয় যারা ছিল তাদের মাঝে আতিয়া বিন আসওয়াদ হান্‌ফী, আব্দুল্লাহ বিন মাহুস ও তার দু ভাই উসমান ও যুবাইর ছিল। তারা সংখ্যায় প্রায় ত্রিশ হাজার ছিল। তারা হযরত আলী (রা.) কে কাফির (নাউযুবিল্লাহ) বলেছিল এবং মুনাফিকের নিন্দায় নাযিল হওয়া আয়াত হযরত আলীর জন্য নাযিল হয়েছে বলে ফাতওয়া দিয়েছিল। তারা হযরত আলী (রা.) কে হত্যাকারী ইবন মুলজিম সম্বন্ধে বলেছিল যে, ইবন মুলজিমের প্রশংসায় কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ) যা পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

'আযারিকা' খারিজীগণ হযরত উসমান (রা.), হযরত তালহা, যুবাইর, আয়িশা, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) সহ সকল মুসলমানকে কাফির বলত (নাউযুবিল্লাহ) এবং তাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলত।

তারা তাদের বিরোধিতাকারী মানুষের শিশু সন্তান ও স্ত্রীগণকে হত্যা করা মুবাহ মনে করত। তারা মুশরিকদের মৃত শিশু সন্তানকে জাহান্নামী বলত।

তারা কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি সম্বন্ধে বলত যারা কবীরা গুনাহ করবে তারা কাফির হয়ে যাবে এবং কাফিরদের সাথে সর্বদা জাহান্নামে থাকবে।

৩. নাজদাত: 'নাজদাহ' বিন আমীর হানাফীর অনুসারী দল। নাজদাহ ইমামা থেকে তার লোক লস্কর নিয়ে বের হলো। উদ্দেশ্য ছিল আযারিকা দলের সাথে একত্র হবে। কিন্তু আবূ ফুদাইক ও আতিয়া বিন আসওয়াদ আযারিকার বিরোধিতা করল। তারা নাজদার হাতে বাইআত হলো এবং নাজদাকে আমীরুল মুমিনীন নাম দিল। পরে নাজদার দলের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং আরো দলাদলীর সৃষ্টি হয়।

খারিজীদের আরো কয়েকটি দল হলো-

'বাইহাসিয়া' আবূ বাইহাস আল হাইসাম বিন জাবির এর দল।

'আজারিদা' আব্দুল করিম বিন আজরাদ এর দল।

'সাআলিবা' সা'লাবা বিন আমীর এর দল।

'ইবাদিয়া' আব্দুল্লাহ বিন ইবাদ এর দল।

'সুফরিয়া' যিয়াদ বিন আসফর এর অনুসারী দল। আযারিকা, নাজদাত ও ইবাদিয়া দলের সাথে এদের অনেক মতপার্থক্য ছিল।

উল্লেখিত খারিজী দলগুলোর অনেক উপদল ছিল। আল্লামা শাহারিস্থানী (জন্ম ৪৭৯ হিজরী, মৃত্যু ৫৪৮) আল মিলাল ওয়ান্নাহল কিতাবের ১ম খণ্ডের ১৩১ পৃষ্ঠা থেকে ১৬১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত খারিজীদের বিদআতী আকীদা, তাদের কুরআনের অপব্যাখ্যা ও গোমরাহীর বর্ণনা লিখেছেন। এর মধ্য থেকে সামান্য আলোকপাত এখানে করা হয়েছে।

হযরত আলী (রা.) এর ঘাতকও একজন খারিজী ছিল। তার নাম আব্দুর রহমান বিন মুলজিম। হযরত আলী (রা.) এর শাহাদাতের খবর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বেই দিয়েছিলেন। একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা.) কে বললেন, হে আলী! আগেকার লোকদের মাঝে সবচেয়ে বদবখত ঐ লোক ছিল যে হযরত সালিহ (আ.) এর উটের পা কেটেছিল। আর পরবর্তী লোকদের মাঝে এ ব্যক্তি সবচেয়ে বদবখত যে তোমার দাড়ি তোমার মাথার রক্তে রঞ্জিত করবে।

নাহরাওয়ানের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) এর হাতে খারিজীরা খুবই পর্যুদস্ত হয়েছিল। তাদের সকল শক্তি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই নাহরাওয়ানের যুদ্ধস্মৃতি বেঁচে যাওয়া খারিজীদের অন্তরে খুব প্রভাব ফেলেছিল। ঘটনাক্রমে একবার খারিজীদের তিন ব্যক্তি আব্দুর রহমান বিন মুলজিম, উমর বিন বকর তামিমী ও বরক বিন আব্দিল্লাহ মক্কায় একত্র হলো। তারা নাহরাওয়ানে নিহত খারিজীদের জন্য খুব আফসোস করল। তারপর তারা পরস্পর পরামর্শ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, হযরত আলী (রা.), মুআবিয়া (রা.) ও আমর বিন আস (রা.) এ তিনজনকে হত্যা করে ফেলতে হবে। যাতে ইসলামী জগতে শান্তি বিরাজ করে এবং নাহরাওয়ানের যুদ্ধের প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে যায়। দীর্ঘ আলোচনার পর ইবন মুলজিম বলল, আমি আলীকে হত্যা করার ভার নিলাম।

বরক বলল, আমি মুআবিয়াকে হত্যা করব। উমর বিন বকর আমর বিন আসকে হত্যার ভার গ্রহণ করল। তিনজন তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব গ্রহণের পর চল্লিশ হিজরীর সতেরো রামাদান তিনজনের কতলের তারিখ নির্ধারণ করল। ইবন মুলজিম কুফায় পৌঁছল বাকি দুজন শাম ও মিসরে গেল। শাম ও মিসরে যে দুজন গিয়েছিল তারা অকৃতকার্য হলো এবং নিজেরা নিহত হলো। কিন্তু ইবন মুলজিম তার অপকর্মে কৃতকার্য হয়ে গেল।

চল্লিশ হিজরীর সতেরো রামাদান শেষ রাত্রে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.) পুত্র ইমাম হাসানকে (রা.) ঘুম থেকে জাগিয়ে বললেন, আমি আজ স্বপ্নে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখলাম। আমি তাঁর খিদমতে হাযির হয়েছি। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার উম্মত থেকে বড়ই কষ্ট পেয়েছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এদের জন্য বদদুআ কর। তখন আমি বললাম, ইয়া আল্লাহ! এদের বদলে আমাকে ভালো লোক দান করুন। আর এদেরকে আমার বদলে কোনো মন্দ লোক দিন। হযরত আলী এসব কথা বলছিলেন। ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গেল। মুআযযিন আযান দিলেন। হযরত আলী মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন। হযরত আলী (রা.) এর অভ্যাস ছিল ফজরের সময় মসজিদে যাওয়ার পথে 'আসসালাত আসসালাত' বলতেন।

এদিন ইবন মুলজিম বিষমিশ্রিত তরবারি নিয়ে তার দুজন সঙ্গী শাবিব ও ওরদানসহ পথে ঘাপটি মেরে বসেছিল। হযরত আলী (রা.) কে দেখা মাত্র সে হযরত আলী (রা.) এর কপালে তরবারি দিয়ে আঘাত করল। আঘাত মগজ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। প্রচুর রক্তক্ষরণ হলো। হযরত আলী (রা.) এর দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। চারিদিক থেকে লোকেরা দৌড়ে আসলে ইবন মুলজিম ধরা পড়ে গেল। তার সঙ্গী দুজন পলায়ন করল। মহানুভব আলী ইবন মুলজিমকে তাঁর সম্মুখে হত্যা করতে দিলেন না। তিনি বললেন ইবন মুলজিমকে বন্দী রেখে তার সাথে উত্তম ব্যবহার কর। আমি যদি বেঁচে যাই তবে আমার ইচ্ছা যদি হয় তাকে শাস্তি দেব অথবা ক্ষমা করে দেব। যদি আমি মারা যাই তবে তাকে একটি মাত্র আঘাত করবে। কারণ সে আমাকে একটি আঘাত করেছে। (চলবে)

তাসাওউফ

খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান

মাওলানা মো. গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী

প্রচলিত পদ্ধতিতে জ্ঞান অর্জন ছাড়াও আল্লাহর বিশেষ করুণাপ্রাপ্ত বান্দাহগণ আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে সরাসরি এক ধরনের বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন, যা আল্লাহ তার বান্দাহগণের অন্তরে ইলহামের মাধ্যমে ঢেলে দেন। তাসাওউফের পরিভাষায় এ জাতীয় ইলমকে ইলমে লাদুন্নী বা ইলমে আসরার বা ইলমে বাতিন বলা হয়। বিভিন্ন হাদীস শরীফে এ ধরনের জ্ঞানের কথা বিভিন্নভাবে উল্লেখিত হয়েছে। উবাই বিন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

يا أبا المُنْذِرِ أتَدْرِي أيُّ آيَةٍ مِن كِتابِ اللهِ معكَ أعْظَمُ؟ قالَ: قُلتُ: اللهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ. قالَ:يا أبا المُنْذِرِ أتَدْرِي أيُّ آيَةٍ مِن كِتابِ اللهِ معكَ أعْظَمُ؟ قالَ قُلتُ: اللهُ لا إلَهَ إلَّا هو الحَيُّ القَيُّومُ. (البقرة:٢٥٥). قالَ: فَضَرَبَ في صَدْرِي، وقالَ: واللهِ لِيَهْنِكَ العِلْمُ أبا المُنْذِرِ.

-হে আবুল মুনযির! তুমি কি জানো, আল্লাহর কালামের কোন আয়াতটি তোমার কাছে সবচেয়ে বড়? আমি বললাম, আয়াতুল কুরসী (اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ)। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বুকে আঘাত করলেন এবং বললেন, তোমার এই জ্ঞান বরকতময় হোক। (মুসলিম, আবূ দাউদ, মুসলিমের ভাষ্য)

এই হাদীসে প্রমাণিত হলো, সবচেয়ে ফদীলতসম্পন্ন আয়াত কোনটি তা ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা উবাই ইবন কাবের

অন্তরে ঢেলে দেন। আর নবী করীম ﷺ তাকে মুবারকবাদ দেওয়ার মাধ্যমে উক্ত ইলম বা ইলমে লাদুন্নীর ফদীলত প্রমাণিত হলো।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي خَلَّادٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ يُعْطِي زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يلقى الْحِكْمَة (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

-হযরত আবূ হুরাইরা এবং হযরত আবূ খাল্লাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তোমরা এমন ব্যক্তিকে দেখতে পাও যাকে 'দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ' ও 'কম কথা বলার' বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে, তবে তোমরা তার নিকটবর্তী হও। কেননা তাকে হিকমত বা প্রজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। (ইমাম বাইহাকী শুআবুল ঈমানে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন)

হাদীসে যাকে 'হিকমত' বলা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা-ই ইলমে লাদুন্নী বা খোদা প্রদত্ত জ্ঞান।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخْلَصَ لِلّٰهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ–(أخرجه رزين)

مسند الشهاب: ورواه أبو نعيم في الحلية من جهة مكحول عن أيوب مرفوعا وسنده ضعيف وهو عند أحمد في الزهد مرسل بدون أيوب وله شاهد عن أنس رضي الله عنه (المقاصد الحسنة:٥٩٣)

-হযরত **ইবন আব্বাস (রা.) থেকে** বর্ণিত তিনি বলেন, **রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ** করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ **তাআলার জন্য** একনিষ্ঠভাবে (ইবাদত করে) **চল্লিশটি প্রভাত** অতিবাহিত করে, তার অন্তর থেকে জিহ্বায় হিকমত বা প্রজ্ঞার ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। (আল মাকাসিদুল হাসানাহ)

উল্লেখিত হাদীসের আলোকে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বান্দাহদের বিশেষ কিছু ইলম দান করেন; যা ইতিপূর্বে কখনও বর্ণিত হয়নি বা তা অর্জন করাও সম্ভব নয়। এ ধরনের ইলমকে ইলমে লাদুন্নী বা ইলমে আসরার বা ইলমে বাতিন বলা হয়। আর আল্লাহর খাস বান্দাহর মাধ্যমেই এ ধরনের ইলমের প্রকৃত তত্ত্ব ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় বর্ণিত হয়; যে বিষয়ে ইতিপূর্বে কেউ কিছুই বর্ণনা করেনি। বর্ণিত হাদীস এ ধরনের জ্ঞানকে সমর্থন করে।

আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ– البقرة: ١٥١

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বুখারী শরীফে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন-

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ فِيكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ يَعْنِي مجْرى الطَّعَام (رواه البخاري)

-হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট থেকে দুই পাত্র জ্ঞান সংরক্ষণ করেছি। এর একটি আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করেছি। অপরটি যদি বর্ণনা করি তাহলে এই কণ্ঠনালী কর্তিত হবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস-১২০)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী **(র.) বলেন**,

قلت إطلاق الوعاء على علم بجزئيات معدودة غير مستحسن ولايتصور جعله قسيما ونظيرا لعلوم الشريعة بل المراد العلم اللدني فإن قيل فما معنى قوله فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، قلت معناه أنه لو بثثته باللسان لقطع هذا البلعوم لأن تلك العلوم والمعارف لا يمكن تعليمها ولا تعلمها بلسان المقال بل إنما تدرك بالانعكاس ولسان الحال– (المظهري–١/٩٤١)

-আমি বলি, ইলমের **একটি** পাত্রকে শরীআতের কতিপয় বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সমীচীন নয় এবং একে ইলমে শরীআতের খণ্ডিত অংশ বা উদাহরণ দেওয়ার মতো কতিপয় বিষয় হিসেবে চিন্তা করাও যায় না। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইলমে লাদুন্নী। যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) এর বক্তব্য 'যদি আমি উহা বর্ণনা করি তাহলে এই কণ্ঠনালী দ্বিখণ্ডিত হবে' এ বাক্যের মমার্থ কী? আমি বলব এর অর্থ হচ্ছে, আমি যদি তা জিহ্বার দ্বারা বর্ণনা করি তবে এই কণ্ঠনালী দ্বিখন্ডিত হবে। কেননা এই জ্ঞান বা মারিফত জিহ্বার বর্ণনার দ্বারা শিখা যায় না এবং শিখানোও যায় না। বরং এ জ্ঞান অর্জন করা যায় প্রতিফলন ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে। (তাফসীরে মাযহারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৯)

শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) أشعة اللمعات কিতাবে আল্লামা তিবীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, উক্ত ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সুরক্ষিত বাতিনী ইলম। আর একেই প্রকৃতপক্ষে ইলমে লাদুন্নী বলা হয়।

ইলমে লাদুন্নী বা খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান সম্পর্কে পাঠকদের উদ্দেশ্যে মাওলানা রূমী (র.) এর মসনবী শরীফে উল্লেখিত কতিপয় কবিতা উল্লেখ করছি-

رومیاں آں صوفیاند اے پسر
রূমীয়া আঁ সূফীয়ান্দ আয় পেসার
نے ز تکرار کتاب و نے ہنر
নায় যে তাকরারে কিতাবো নায় হুনার

অর্থ: প্রিয় বৎস! রূমীগণ এমন সূফীদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের কিতাব পাঠ ও শিল্প-বিজ্ঞান শেখার প্রয়োজন নাই।

لیک صیقل کردہ اند آں سینا
লেকে ছায়কাল করদা আন্দ আঁ সীনা
پاک ز آز وحرص وبخل وکینہ ہا
পাক যে আযও হিরছো বোখলো কীনাহা

অর্থ: কিন্তু তারা নিজেদের বক্ষকে পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে, লোভ-লালসা, কৃপণতা ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র থেকেছে।

آں صفائے آئینہ وصف دل است
আঁ ছাফায়ে আঈনা ওয়াছফে দেলাস্ত
صورت بے منتہا را قابل ست
সূরতে বেমুনতাহা রা কাবেলাস্ত

অর্থ: অতঃপর তাদের দিল ঐ আয়নার ন্যায় **স্বচ্ছ** ও পরিচ্ছন্ন হওয়া তাদের অন্তরের **বৈশিষ্ট্য হয়ে** যায়, ফলে তারা অনন্ত জ্ঞান হাসিলের যোগ্য হয়ে যায়।

عکس ہر نقشے نتابد تا ابد
আকসে হার নকশে নাতাবাদ তা আবাদ
جز ز دل ہم با عدد ہم بے عدد
জুয যেদিল হাম বা আদদ হাম বে আদদ

অর্থ: অন্তর ব্যতীত এমন কিছুই নাই যাতে নকল বিষয়ের নকশা অঙ্কন করা যায়, আর ঐ চিত্র গণনাযোগ্য হোক আর না হোক।

اہل صیقل رستہ اند از بو ورنگ
আহলে ছায়কাল রাস্তাআন্দ আয বূ ও রাঙ্গ
ہر دے بینند خوبی بے درنگ
হার দামে বীনান্দ খুবী বে দারাঙ্গ

অর্থ: যাদের অন্তর পরিষ্কার তারা মেহনত করে ইলম হাসিল করা থেকে মুক্তি লাভ করেছেন, তারা সর্বদা প্রশংসনীয় ইলম বিনা দ্বিধায় প্রত্যক্ষ করেন।

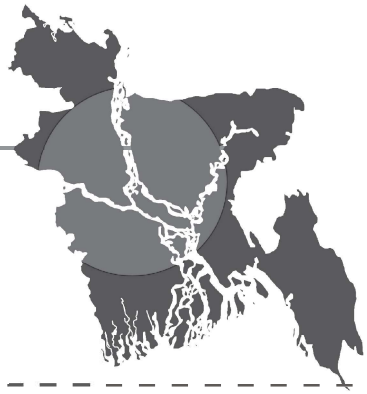

ষোলই ডিসেম্বরের শিক্ষা

অধ্যাপক আবদুল গফুর

ইসলামের একটি শিক্ষা হলো, পৃথিবীতে আল্লাহ কোন জাতি বা জনগোষ্ঠীকে যখন কোন সুযোগ বা ক্ষমতা দান করেন, তখন সেই জাতি বা জনগোষ্ঠী যদি আল্লাহর সেই নিআমতের মর্যাদা দিতে সক্ষম না হয় এবং সেই নিআমতের আলোকে আল্লাহর আনুগত্য করার পরিবর্তে তারা যদি আল্লাহর নাফরমানী, অকৃতজ্ঞতা এবং পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা ও বিলাসব্যসনে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, আল্লাহ তখন তাদেরকে সেই নিআমত থেকে বঞ্চিত করে দেন। এমনকি এই জনগোষ্ঠী যদি মুসলিম নামধারীও হয়, তবুও আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান হতে তারা মুক্তি পায় না। ইসলামের আরেকটি শিক্ষা হলো, প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহ মানুষকে স্বাধীনতাপ্রিয় করে সৃষ্টি করেছেন। ইসলামের মূল আদর্শ তাওহীদ, আর এই তাওহীদের মূল শিক্ষাই হলো, এক আল্লাহ ছাড়া কেউ মানুষের ইলাহ বা প্রভু নয়। এ কথাটা যেমন ব্যক্তির জীবনে সত্য, তেমনি সত্য যেকোন জনগোষ্ঠীর জন্য। শুধু পেশিবল প্রয়াগ করে কোন মানুষকে যেমন চিরদিনের জন্য গোলাম করে রাখা যায় না, তেমনি কোন জনগোষ্ঠীকেও গায়ের জোরে অস্ত্রের জোরে পদানত করা বা পদানত করে রাখার চেষ্টা পরিণামে সাফল্যমন্ডিত হয় না। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, এমনকি অতি সম্প্রতিকালের সম্প্রসারণবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আজকের বিশ্ব মানবের সোচ্চার হয়ে ওঠা থেকে ইসলামের এই মহান শিক্ষার সঙ্গে মানব প্রকৃতির গভীর সম্পর্কই দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়। কোন ব্যক্তি বা কোন জনগোষ্ঠীকে অন্যায়ভাবে শৃঙ্খলিত করতে চাইলে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে যে ব্যর্থ হতে বাধ্য, তা যেমন অন্যান্য মানুষের বেলায় সত্য, তেমনি সত্য মুসলমানদের বেলায়।

ইসলাম মানব-ইতিহাসের চালিকাশক্তির সঠিক পথনির্দেশ করেছে এবং কুরআনুল কারীমে বারবার তাকীদ দেওয়া হয়েছে, অতীতের বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাস হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে। কিন্তু ইতিহাসের বড় শিক্ষা হলো ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় না। এরই পরিণতিতে মানব জাতি পৃথিবীর দিকে দিকে আজ চরম ভোগান্তির মধ্যে কালাতিপাত করছে। কুরআনুল করীমের নির্দেশনার আলোকে মানুষ যদি সুদূর ও নিকট অতীতের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পথ চলত, তবে তার দুঃখ-দুর্দশা অবশ্যই কম হত।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর এবং তার ঐতিহাসিক পটভূমির দিকে তাকালে আমরা কী দেখি? আমরা দেখি, পূর্বতন মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষের মাধ্যমে একটি নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে ১৬ই ডিসেম্বরে। ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত লজ্জাকর ঘটনা হিসেবে পাকিস্তানের প্রায় এক লক্ষ মুসলিম সৈন্য সেদিন যিল্লতীর পরাজয় বরণ করে। ১৬ই ডিসেম্বর যেমন একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের দিন হিসেবে পরম গৌরবের দিন, তেমনি একটি যালিম মুসলিম শক্তির যুলমের পরিণতি হিসেবে চরম যিল্লতী বরণের লজ্জাকর দিনরূপে সবার জন্য এক শিক্ষণীয় ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত।

১৬ই ডিসেম্বর শিক্ষা দেয় ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনাই গভীর তাৎপর্যবহ এবং মানুষের কার্যকারণ কর্মফলের দৃষ্টান্তস্থল। ১৬ই ডিসেম্বর হঠাৎ রাতারাতি ঘটে নাই। ১৬ই ডিসেম্বরের পেছনে ছিল ২৫শে মার্চের নারকীয় হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের বেদনাদায়ক ঘটনা। সেদিনকার পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের একটি অংশের নিরীহ জনগণের উপর সেনাবাহিনী নৃশংস হামলা চালিয়ে যে অকল্পনীয় যুলমবাজীর পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল, তথাকথিত স্বদেশের সেনাবাহিনী স্বদেশের জনগণকে পরাভূত করার যে স্পর্ধা দেখিয়েছিল, তারই পরিণতিতে তারা জনগণের ধিক্কার কুড়িয়েছিল। আর তারই পরিণাম ফল হিসেবে একটি দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী হিসেবে পরিচিত পাকিস্তানী বাহিনী চরম যিল্লতীর ভাগ্যবরণ করেছিল।

ষোলই ডিসেম্বর প্রমাণ করেছে, যুলমের পরিণাম যে কখনো শুভ হতে পারে না, যালিমদের দম্ভ ও হঠকারীতাকে আল্লাহ যে বরদাশত করেন না এবং আল্লাহর বিধান যে অমুসলিম ও মুসলিম নামধারী নির্বিশেষে সকলের জন্যই একইরূপ কার্যকরী- এই মহান সত্যের অনিবার্যতা। দু'শ বছরের জানা অজানা অসংখ্য সাধক ও সংগ্রামীর সাধনা ও সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসেবে আল্লাহ এই উপমহাদেশের দুই প্রান্তে অবস্থিত দুই ভূখন্ডের দুটি মুসলিম আবাসভূমিতে ঐক্য ও সমঝোতার ভিত্তিতে বসবাসের যে অনন্য নিআমত দিয়েছিলেন, তার উপযুক্ত মর্যাদাদানে যোগ্যতার প্রমাণ সাতচল্লিশ-পরবর্তী নেতৃবৃন্দ দিতে পারেন নি। কী পশ্চিম কী পূর্ব, উভয় অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের জন্য কথাটি কম-বেশি খাটে। সুতরাং আল্লাহ**র প্রাকৃ**তিক বিধানেই এই নিআমত থেকে উপমহাদেশের মুসলিম জনগণকে বঞ্চিত করে এক মহান পরীক্ষার মধ্যে তাদের নিক্ষেপ করা হয়েছে।

আল্লাহর বিধানে ওয়াদা ভঙ্গের শাস্তি সুকঠোর। পাকিস্তান অর্জন করা হয়েছিল ইসলামের ওয়াদায়। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ জনগণের কাছে প্রদত্ত তাদের এই ওয়াদা বেপরোয়াভাবে লঙ্ঘন করে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, কলহ-কোন্দল এবং ভোগ-বিলাসে উন্মত্ত হয়ে পড়ে। ১২০০ মাইল ব্যবধানের দুটি স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন ভূ-খন্ড মিলে একটি রাষ্ট্র গড়ার প্রস্তাব এমনিতেই ছিল ইতিহাসের নযীরবিহীন অসাধারণ ও সুকঠিন একটি ব্যাপার। এই সুকঠিন দায়িত্ব পালন সম্ভব হত যদি ইসলামী আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার সাধনায় নেতৃবৃন্দ একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করতেন। ভৌগোলিক সংলগ্নতাবর্জিত দু'টি ভূখণ্ড যার মধ্যে ভাষা, আবহাওয়া প্রভৃতি অনেক বিষয়েই মিল ছিল না, তার একমাত্র যোগসূত্র ছিল ইসলাম; অথচ যোগসূত্রের সেই একমাত্র উপাদানটিকেই করা হলো চরমভাবে অবহেলা। ফলে স্বার্থপরতা ওয়াদা ভঙ্গের পরিণতিতে যা হওয়ার, তাই হলো।

ষোলই ডিসেম্বরের আরেকটি শিক্ষা এই যে, মানবপ্রকৃতির মধ্যেই আল্লাহ স্বাধীনতার অদম্য আকুতি সৃষ্টি করেছেন। হাজার বছরের গোলামী যিন্দেগীর চাইতে একদিনের আযাদ জীবনকে মানুষ অনেক বেশি মূল্য দেয়। বাংলার মানুষ একদিন পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল স্বাধীন দেশে বসবাস করার স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু ভিতরে এক শ্রেণির পশ্চিমা নেতা ও আমলা চাইছিলেন বাংলার বুকে পাঞ্জাবী আধিপত্যবাদ কায়িম করতে, যার নৃশংস বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ২৫শে মার্চের কালো রাতে। স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতাকামী জনগণ এই প্রভুত্ববাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল এক অসম যুদ্ধে। মানুষের স্বাধীনতা কামনা যে দুর্দমনীয় এবং যুলম, হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যে মানুষের স্বাধীনতা কামনাকে স্তব্ধ করা যায় না, তার প্রমাণ ষোলই ডিসেম্বর। পাকিস্তানী বাহিনীর নয় মাসের বর্বর অভিযানে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, শত শত মা-বোনের ইযযত হরণ করা হয়েছে, ধ্বংস

করা হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ আর এসব করা হয়েছে ইসলাম রক্ষার নামে। কিন্তু চির ইসলামপ্রিয় বাংলার মানুষ এসব কথায় কান না দিয়ে প্রমাণ করেছে, ইসলাম এবং যুলম বর্বরতাকে তারা কখনও সমার্থক মনে করতে অভ্যস্ত নয়। তারা তাদের এ বিশ্বাসও প্রমাণ করেছে যে, ইসলাম মানুষের স্বাধীনতাকে হরণ করতে আসে নাই, এসেছে এক আল্লাহর ইলাহিয়াতের অধীনে। সমস্ত মানবীয় প্রভুত্ববাদ ও আধিপত্যবাদের শৃঙ্খল ছিন্ন করতে।

ষোলই ডিসেম্বরের শিক্ষাঃ

কোন মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর কোন চিরন্তন শত্রু-মিত্র থাকে না। আজ যে পরম শত্রু, কাল সে পরম সুহৃদও হয়ে যেতে পারে। উপমহাদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এই উপমহাদেশে বৃহৎ দু'টি জাতি- হিন্দু ও মুসলিম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দ্বন্দ্বে রত। দু'টি জাতির ধর্ম, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের পার্থক্যের কারণে সমগ্র উপমহাদেশের মুসলিম জনগণ পাকিস্তান আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আর এই পাকিস্তান আন্দোলনে বাংলার মুসলমানদের অবদান যে ছিল সর্বাধিক, তা এক ঐতিহাসিক সত্য। পাকিস্তান আন্দোলনের মূল সংগঠন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই ঢাকারই বুকে এবং তার প্রধান উদ্যোগ নিয়েছিলেন তদানীন্তন মুসলিম বাংলার অবিসংবাদিত নেতা নবাব সলীমুল্লাহ। ১৯৪০ সালে বাংলারই আরো এক কৃতিসন্তান শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পাকিস্তান দাবি যখন ব্রিটিশ ও কংগ্রেসের চরম বিরোধিতার মুখে প্রবল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তখন বাংলার আর এক কৃতিসন্তান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বাধীন উপমহাদেশের একমাত্র মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা সেই ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে দৃঢ়ভাবে কায়েদে আযমের পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন দিয়ে পাকিস্তান দাবিকে জোরদার ও অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। প্রধানত বাংলার মুসলমানদের প্রবল সংগ্রামের ফলেই, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সেদিন সম্ভব হয়। সাতচল্লিশের ১৪ই আগস্টের পূর্বে যে বাংলার মুসলমানরা প্রাণপাত করল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য, একাত্তরে এসে তাদেরই অস্ত্র ধরতে হলো পাকিস্তান ধ্বংসের জন্য। কারণ পঁচিশে মার্চের পর পাকিস্তান টিক্কাশাহীর কল্যাণে বাংলার মুসলমানদের জন্য হয়ে উঠেছিল এক শ্বাসরুদ্ধকর গোলামীস্থান, যা ছিল বর্বরতা, পৈশাচিকতা ও উন্মত্ত হত্যাযজ্ঞের প্রতীক। স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতাকামী বাংলার দামাল ছেলেরা সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এক অসম প্রাণান্তকর সংগ্রামে।

কিন্তু বাংলার এই বীর ছেলেরা সেদিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে এজন্য ঝাঁপিয়ে পড়েনি যে তারা পিণ্ডির বদলে দিল্লীর প্রভুত্ব মেনে নেবে। একাত্তরের পর তাই যখন দেখা গেল পিণ্ডির প্রভুত্বের অবসানের পর দিল্লীর ব্রাহ্মণ্যবাদী নয়া চাণক্যাগোষ্ঠী স্বাধীন বাংলাদেশকে তাদের পেটুয়া রাষ্ট্রে পরিণত করার ফন্দী-ফিকির আটছে, তখন তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারা বুঝল, একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি পর্ব শেষ হয়েছে মাত্র, শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্ব; যা বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং শত্রুর বৃহত্তর শক্তিমত্ততার কারণে হবে আরো দীর্ঘায়িত, আরো সুকঠিন, আরো প্রাণান্তকর। বাহাত্তর থেকে শুরু হওয়া এই সংগ্রামের পালা আজও চলেছে, কবে শেষ হবে কেউ বলতে পারে না। একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরের পর ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক পাকিস্তানী বাহিনীর পরিত্যক্ত কোটি কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র এবং বড় বড় মিল কারখানার যন্ত্রপাতি ভারতে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে গঙ্গার পানি বণ্টন সম্পর্কে বাংলাদেশের সঙ্গে স্থায়ী সমঝোতার পূর্বেই ফারাক্কা বাঁধ চালু করে বাংলাদেশের পশ্চিম দক্ষিণ অঞ্চলের ৮টি জেলাকে মরুভূমিতে পরিণত করার অপচেষ্টা, তিস্তাসহ আরো আটটি নদীর প্রবাহ থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে বাঁধ ও গ্রোয়েন নির্মাণ, বাংলাদেশের বাকী অংশ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সংযোগ খাল খননের মাধ্যমে কব্জা করার সুচতুর পরিকল্পনা, বাংলাদেশের উপর দিয়ে রেল ও নৌ ট্রানজিট চালানো, বেরুবাড়ী, দহগ্রাম, আঙ্গরপোতা ও তালপট্টিতে তার আগ্রাসী ভূমিকা, আসাম ও বিহারে বাঙ্গাল খেদানোর অজুহাতে মুসলমান খেদা অভিযান চালানো, সর্বশেষ-বাংলাদেশের ছয়টি জেলাকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে দিল্লীর বুকে তথাকথিত 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্টে'র মাধ্যমে 'বঙ্গভূমি' রাজ্য গঠনের পাঁয়তারা চলছে। এসব ঘটনা থেকে আজ জনগণের কাছে সুস্পষ্টঃ আজ বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তার প্রধান শত্রু কে? তাই বলছিলাম, ষোলই ডিসেম্বরের এক মহান শিক্ষা হচ্ছে, জাতির জীবনে চিরন্তন শত্রু মিত্র বলে কিছু থাকতে পারে না।

এই পরম সত্যটি উপলব্ধি না করে পুরাতন অভ্যাস বশত আজও যারা তথাকথিত বন্ধু রাষ্ট্রের দেব-চরিত্রের গুণগান করণে অন্ধ একাগ্রতা প্রদর্শন করছেন, তাদের চৈত্র মাসে পৌষের গান জনগণের কানে বেসুরোই বাজছে, যদিও সেদিকে নযর দেওয়ার তাদের অবকাশ নেই।

এ প্রসঙ্গে এ কথা অবশ্যই বলতে হবে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে অনেক স্বাধীনতাকামী, বিশেষত ইসলামপন্থী নেতৃত্বের এক বিরাট অংশ সেদিন দুঃখজনক ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পিছনে মুসলমানদের বহু শতাব্দীর পরীক্ষিত শত্রু ব্রাহ্মণ্যবাদীর সাময়িক মদদ দেখে এই যুদ্ধকে তারা ভুল বুঝেছিলেন। অথচ তারা গভীরভাবে ভেবে দেখেন নি যে, মুক্তিযোদ্ধাদের শতকরা ৯৯ ভাগই মুসলমান এবং স্বাধীনতার জন্য তাদের আন্তরিকতা ছিল সব সংশয়ের উর্ধ্বে। পরবর্তীকালে এই মুক্তিযুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণকারী অসংখ্য জানা-অজানা মুক্তিযোদ্ধা ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রজালের শিকার হয়েছেন। ইসলামের সঙ্গে বর্বরতা ও যুলুম নির্যাতনের কোন সম্পর্ক যে থাকতে পারে না, সেদিন এই সত্য উপলব্ধি করতে এবং সোচ্চার কণ্ঠে তা ঘোষণা করতে অনেকেই ব্যর্থ হয়েছেন। তবে মানুষ মাত্রেই ভুল হতে পারে। সেই ভুল স্বীকারে কোন লজ্জা বা গ্লানির কিছু নেই থাকা উচিতও নয়।

ষোলই ডিসেম্বরের আরো একটি বড় শিক্ষা, মানুষের স্বাধীনতার আকুতি কোন দিনই পশুশক্তি বলে দমন করা যায় না। আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে শুধু স্বাধীনতার আকুতি সৃষ্টি করে দিয়েই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি আরো শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে মাথা নত করবে না, হোক সে পার্থিব বিচারে বিরাট শক্তি। একাত্তরে প্রবল পরাক্রান্ত পাকিস্তানী বাহিনী যেমন পারেনি বাংলার জনগণের স্বাধীনতা কামনাকে স্তব্ধ করতে, তেমনি আজও বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে যারা পরাধীনতায় রূপান্তরিত না করার পায়তারা করছে, হোক তারা বিরাট শক্তিধর, তাদের ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ হতে বাধ্য। তবে এ ব্যাপারে একটাই শর্ত, আমরা কুরআনুল কারীমের শিক্ষা মুতাবিক আল্লাহর অসীম কুদরতে বিশ্বাস স্থাপন করে সর্বস্ব পণ করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে রাজী আছি কি না। অতি আধুনিক ইতিহাসেও প্রমাণ আছে, আল্লাহর অসীম কুদরতে আস্থাবান ও কুরবানীকৃত জাতি দুই পরাশক্তির চক্রান্তের মুকাবিলায় টিকে থাকতে পারে। সুদূর অতীতে বদরে, উহুদে, খন্দকে এ সত্য বারবার প্রমাণিত হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে আমরা যদি আল্লাহর উপরই ভরসা করে ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে অকুতোভয়ে এগিয়ে যাই, কোন আধিপত্যবাদী শক্তিই আমাদের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করতে পারবে না। কুরআনুল করীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'ওয়ালা তাহিনু, ওয়ালা তাহযানু ওয়া আনতুমুল আ'লাওনা ইন কুনতুম মুমিনীন' – "তোমরা নিরাশ হইও না এবং চিন্তান্বিত হইও না তোমারই হবে বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও।" আল্লাহর এই চিরঞ্জীব অভয়বাণী ও আশ্বাসের আলোকে যেকোনো আধিপত্যবাদী শক্তির ভ্রুকুটিকে অগ্রাহ্য করে পরমপ্রিয় স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় করার দুর্নিবার সাধনাই হোক ষোলই ডিসেম্বরের ঐতিহাসিক দিনে আমাদের পবিত্র সংকল্প।

ওয়ায মাহফিল
সুন্নাহ পদ্ধতি ও কয়েকটি প্রস্তাবনা

মারজান আহমদ চৌধুরী

ইসলামের সূচনাকাল থেকে ওয়ায মুসলিম সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কখনো আড়ম্বরপূর্ণ মাহফিলে, কখনো একান্ত হালাক্বায়, ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ্য ও ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে মুসলিম সভ্যতার প্রতিটি পরতে ওয়াযের সুপ্রতিভ উপস্থিতি বিদ্যমান ছিল। ওয়ায শব্দের আভিধানিক অর্থ উপদেশ। প্রচলিত ওয়ায মাহফিলে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক, আল্লাহর বড়ত্ব-মহত্ব এবং নবী-রাসূল ও পুণ্যবানদের জীবনাদর্শকে হৃদয়স্পর্শী ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করা হয়। জনসাধারণের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য এটি সহজতর, সর্বজনবিদিত এবং সুন্নাহ-সমর্থিত পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত।

উম্মাতের উদ্দেশ্যে ওয়ায করা সমস্ত নবী-রাসূলের সুন্নাহ। তাঁদের দায়িত্বের সূচনা হতো ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে। কেবল তা-ই নয়। বান্দার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ওয়ায করেছেন খোদ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কুরআন মাজীদে এমন অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যেখানে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে কোনো কিছু অবহিত করা, বুঝিয়ে বলা অথবা সতর্ক করা অর্থে ‘ওয়ায’ ও ‘বয়ান’ শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। এমনকি পবিত্র কুরআনের একটি নামই হচ্ছে ওয়ায। আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

-হে মানবজাতি, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে একটি ‘ওয়ায’ এসেছে, যা অন্তরের (রোগসমূহের) জন্য শিফা। এটি হিদায়াত এবং মুমিনদের জন্য রহমত। (সূরা ইউনুস, আয়াত-৫৭)

আমাদের নবী সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি আল্লাহ তাআলা যেসব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তন্মধ্যে বেশিরভাগই অর্জিত হয়েছে ওয়াযের মাধ্যমে। মানুষের কাছে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরা, আল্লাহর কিতাব ও শরীআহ শিক্ষা দেওয়া, আখিরাতের প্রতিদান ও শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করার ক্ষেত্রে ওয়ায-নসীহত ও তালীম-তারবিয়াত বড় ভূমিকা পালন করেছে। যদিও রাসূল ﷺ এর সঙ্গই একজন মানুষের জীবন পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট ছিল, তবুও তিনি সাহাবীদের উদ্দেশ্যে নিয়মিত ওয়ায করতেন। ইসলামী আকীদা ও জীবনদর্শনের যেসব সবক আমরা হাদীসের কিতাবসমূহে পাই, সবই আমাদের নবী ﷺ এর খুতবা তথা ওয়াযের অংশবিশেষ।

রাসূল ﷺ ওয়ায শুরু করতেন আল্লাহর হামদ ও সানা দিয়ে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মূল বক্তব্য শুরু করার পূর্বে ‘খুতবাতুল হাজাহ’ নামে একটি বিশেষ খুতবা পাঠ করতেন। পাঠকের জন্য খুতবাটি তুলে ধরা হলো-

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

উল্লেখ্য যে, খুতবাতুল হাজাহ’র শব্দের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। খুতবাতুল হাজাহ পাঠ করার পর রাসূল ﷺ কুরআন শরীফের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করতেন। এরপর মানুষকে নসীহত করতেন (আবূ দাউদ, হাদীস-১১০১)। এমনিতেও তাঁর বক্তৃতা কুরআনের আয়াতে ভরপুর থাকত। কেননা আল্লাহ তাআলা কুরআনকে মানবজাতির জন্য শ্রেষ্ঠতম ওয়ায হিসেবে নাযিল করেছেন। আল্লাহ বলেছেন-

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

-এটি মানুষের জন্য বয়ান (স্পষ্ট বর্ণনা) এবং মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৩৮)

রাসূল ﷺ এর ওয়ায ছিল মধ্যম দৈর্ঘের (আবূ দাউদ, ১১০১)। প্রাত্যহিক নসীহতের বেলায় তিনি বক্তৃতা লম্বা করতেন না। তবে মাঝেমধ্যে ইলমী বিষয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ওয়ায করতেন। একবার তিনি ফজরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বয়ান করেছিলেন। মধ্যখানে কেবল নামাযের বিরতি ব্যতীত আর কোনো বিরতি নেননি। সে বায়ানে তিনি সৃষ্টির সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে এবং হবে, সবই জানিয়েছেন (সহীহ মুসলিম, ২৮৯২)। রাসূল ﷺ এর কথাগুলো ছিল পরিষ্কার ঝরঝরে। তাড়াহুড়ো করে, অগোছালোভাবে তিনি কথা বলতেন না। কেউ চাইলে তাঁর কথা থেকে প্রতিটি শব্দ গুনতে পারত (সহীহ বুখারী, ৩৫৬৭)। তিনি অধিক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা এবং কাউকে ইঙ্গিত করে নিন্দামন্দ করা থেকে সম্পূর্ণরূপে পাক ছিলেন। কথাকে গুরুত্বারোপ করার জন্য তিনি মাঝে মাঝে কসম করতেন। কথা বলার সময় হাত নাড়াতেন। রাসূল ﷺ প্রতিদিন ওয়ায করতেন না। সাহাবীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্দিষ্ট দিনে করতেন, যাতে মানুষের মধ্যে ক্লান্তি না আসে (সহীহ বুখারী, ৬৮)। তিনি শ্রোতার প্রয়োজন, মেধার পর্যায় ও পারিপার্শ্বিকতা ভেদে নসীহত করতেন। তাই দেখা যায়, কোনো বক্তৃতায় তিনি কেবল কুরআনকে আঁকড়ে ধরার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন (তিরমিযী, ২৯০৬), কোথাও কুরআন ও সুন্নাহকে (মুয়াত্তা, ১৮৭৪), আবার কোথাও কুরআন ও আহলুল বাইতকে (সহীহ মুসলিম, ২৪০৮)। দেখা যায়, একই জিজ্ঞাসার বিপরীতে ভিন্ন মানুষকে তিনি ভিন্ন আমলের কথা বলেছেন। কারণ তিনি জানতেন, কার কী প্রয়োজন এবং কে কতটুকু নিতে পারবে। রাসূল ﷺ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুব জোর দিয়ে ওয়ায করতেন। (অবস্থাভেদে কখনো) কথা বলার সময় তাঁর চোখ লাল হয়ে যেত, চেহারা মুবারকে রাগ ফুটে উঠত, কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেত। মনে হতো যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যদেরকে সতর্ক করছেন (সহীহ মুসলিম, ৮৬৭)। আবার কখনো খুব আবেগময় হৃদয়স্পর্শী ভঙ্গিমায় ওয়ায করতেন, যাতে শ্রোতাদের অন্তর বিগলিত এবং চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত (আবু দাউদ, ৪৬০৭)। জান্নাত ও জাহান্নামের কথা এমনভাবে বলতেন, যেন শ্রোতারা তাদের চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন (সহীহ মুসলিম, ২৭৫০)। রাসূল ﷺ কখনো মিম্বারের উপর, কখনো মাটিতে বসে বা দাঁড়িয়ে, কখনো উট বা খচ্চরের উপর বসেও ওয়ায করেছেন। মোটকথা, রাসূল ﷺ এর সবচেয়ে বড় সুন্নাহের মধ্যে একটি সুন্নাহ হচ্ছে ওয়ায-নসীহত, যা আজও তাঁর উম্মাতের মধ্যে বহুলভাবে প্রচলিত আছে।

যুগ যুগ ধরে আমাদের বাংলাভাষী অঞ্চলে ওয়ায মাহফিল সবচেয়ে লোকপ্রিয় দ্বীনি সমাবেশ হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। রাষ্ট্রীয় পরিসরে কিছুটা কম হলেও সামাজিক পরিসরে ওয়াযের বিপুল প্রভাব বিদ্যমান। এ অঞ্চলের নিম্নমধ্য, উচ্চমধ্য ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো ওয়ায মাহফিলের দ্বারা প্রভাবিত। আমাদের পারিবারিক পরিমণ্ডলে দ্বীনি রীতিনীতি যে এখনও বহাল আছে, তার পেছনে ওয়ায মাহফিলের অবদান অনস্বীকার্য। ওয়ায মাহফিল এ অঞ্চলে ধর্মীয় জনমিতি পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়েছে, সামাজিক কুরীতি-কুসংস্কার দূরীকরণের নিয়ামক হয়েছে এবং কিছুটা হলেও আর্থিক অনাচার রোধে সহায়ক হয়েছে। নানাবিধ ফিতনার মধ্যেও বিশুদ্ধ আকীদা ও আমালের প্রতি জনসাধারণকে টেনে আনতে বড় ভূমিকা পালন করেছে। কেবল সীমিত পরিসরে মাদরাসা শিক্ষা এ অঞ্চলের মুসলমানদেরকে এতটা ধর্মপ্রাণ বানাতে পারত না, যদি এর সাথে ওয়ায মাহফিল যুক্ত না হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের ওয়ায মাহফিলের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও এর গুণগত মান মোটেও বাড়ছে না। সেই সাথে যুক্ত হয়েছে বহিঃস্থ (ইসলাম-বিদ্বেষীদের) প্রতিবন্ধকতা এবং অন্তঃস্থ (মুসলমানদের মধ্যকার) ফিতনা। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ ও যুগের বাস্তবতার নিরিখে সম্মানিত ওয়াইযদের জন্য কয়েকটি প্রস্তাবনা পেশ করতে চাই।

প্রথমত, ওয়ায-নসীহতের মূল ভিত্তি হতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ। রাসূল ﷺ বলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ ওয়ায (কথা) হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হিদায়াত হচ্ছে মুহাম্মাদ ﷺ এর হিদায়াত (সহীহ মুসলিম, ৮৬৭)। তাই ওয়ায মাহফিলে সময় কাটানো কিংবা শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করার জন্য নিছক বানোয়াট কিচ্ছাকাহিনী সমূলে পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের হাদীস, আকাঈদ ও ফিকহ শাস্ত্র যে পরিমাণ সতর্কতার সাথে এবং সুসংহত মূলনীতির ভিত্তিতে সংকলিত হয়েছে, সেরকম সতর্কতার সাথে ইতিহাস কিংবা বিষয়ভিত্তিক ব্যক্তিগত কিতাবাদি রচিত হয়নি। তাই ওগুলোতে এমন কিছু কথাবার্তা প্রবিষ্ট হয়েছে, যা ভুল এবং ক্ষেত্রবিশেষে ইসলামের মেজাযের সাথে সাংঘর্ষিক। উদাহরণস্বরূপ, তাফসীর শাস্ত্রে অনেক 'ইসরাঈলী রিওয়ায়াত' রয়েছে, যার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। এটি আমার নয়, বরং ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.) এর মত। অতএব তাফসীর বিল-মাসুর তথা যে সব আয়াতের তাফসীর খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীরা করেছেন, সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা এবং তাফসীর বির-রায় তথা যেসব আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখকের নিজস্ব মতামত প্রবেশ করেছে, সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা এক নয়। একজন আলিম যখন শরীআতের ব্যাপারে কথা বলেন, তখন বুঝা যায় যে, তিনি কুরআন-সুন্নাহের ভিত্তিতে কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি যখন জাগতিক জ্ঞান তথা বিজ্ঞান, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, ইতিহাস, প্রাণীবিদ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলেন, স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাঁর সময়ে উপলব্ধ তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতেই কথা বলবেন। আর এটি জানা কথা যে, কুরআন-সুন্নাহ অকাট্য এবং জাগতিক জ্ঞান সদা পরিবর্তনশীল। আজ থেকে পাঁচ-সাতশ বছর আগে সৃষ্টিজগত সম্পর্কে মানুষের যে ধারণা ছিল, আজ এরচেয়ে বহুগুণ স্পষ্ট ধারণা। কারণ দিন দিন নতুন তথ্য উপলব্ধ হচ্ছে। যেমন, অনেকে তাঁদের লিখনিতে পৃথিবীকে 'স্থির' বলেছেন। অথচ আজ আমরা জানি যে, পৃথিবী স্থির নয়। মহাকাশে যা কিছু আছে সবই নিজস্ব কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান। কেউ বলেছেন, সূর্য পৃথিবী থেকে সাত গুণ বড়। অথচ সূর্য পৃথিবী থেকে তের লক্ষ গুণ বড়। কেউ বলেছেন, আমুদরিয়া ও সারদরিয়া নদীদ্বয় হিন্দুস্থানে অবস্থিত। অথচ ওগুলোর অবস্থান মধ্য এশিয়ায়। চীনের মহাপ্রাচীরকে অনেকে যুলকারনাইনের তৈরি প্রাচীর বলেছেন। অথচ এ দুটি তথ্যই ভুল। আমরা তাঁদের প্রতি দোষারোপ করছি না। বরং এ সত্যটি বুঝাতে চাচ্ছি যে, যে যুগে যে কিতাব লেখা হয়েছে, লেখক সে যুগে উপলব্ধ তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতেই তা লিখেছেন। যেহেতু পবিত্র কুরআন কোনো নির্দিষ্ট যুগের জন্য আসেনি, তাই নির্দিষ্ট যুগের নির্দিষ্ট জ্ঞান দ্বারা কুরআনের সবকিছু নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কুরআনের ইলমের রহস্যরাজি কিয়ামাত পর্যন্ত খুলতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ

-জ্ঞানীরা কুরআন থেকে (জ্ঞান আহরণ করতে করতে) তৃপ্ত হবে না। বারবার তিলাওয়াত করলেও এটি পুরোনো হবে না এবং এর নিগূঢ় ও বিস্ময়কর রহস্য কখনও শেষ হবে না। (তিরমিযী, হাদীস-২৯০৬)

কুরআন শরীফে পাঁচশটির মতো আয়াত এসেছে শরীআতের নিয়মনীতি সংক্রান্ত। পক্ষান্তরে এক হাজারের মতো আয়াত এসেছে জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায়। হাজারের বেশি আয়াত এসেছে অতীত ইতিহাস ও ভবিষ্যতের সংবাদ বিষয়ে। তাই একজন মুহাদ্দিস, মুফাসসির বা ফকীহ যখন ইলমে শরীআতের ব্যাপারে কথা বলেন, তখন আমরা শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করব। দ্বীন সম্পর্কে তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অবগত। তবে তাঁরা যখন জাগতিক জ্ঞানের ব্যাপারে কথা বলেন, তখন আমাদেরকে সেটি খতিয়ে দেখা উচিৎ। কারণ সন্দেহের উর্ধ্বে কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ। যে অকাট্য বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কালামকে গ্রহণ করা হয়, একই রকম বিশ্বাস নিয়ে কারও ব্যক্তিগত রচনা, মতামত বা ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, ওয়াযের মাহফিলে রাসূল ﷺ এর মানাকিব, মুজিযা, সাহাবায়ে কিরাম ও আউলিয়ায়ে কিরামের মর্যাদা, কারামাত, তাঁদের শিক্ষা ও আদর্শ বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রেও কেউ কেউ এমন বানোয়াট বর্ণনা উপস্থাপন করেন যা ক্ষেত্রবিশেষে ঈমান-বিধ্বংসী। মনে রাখা উচিত, আমাদের নবী ﷺ এর যে মান ও মর্যাদা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বয়ান করেছেন, তার চেয়ে বাড়িয়ে বলা কোনো মাখলুকের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার কেউ এর থেকে বিন্দুমাত্র কমাতেও পারবে না। অতএব কুরআন, হাদীস ও সাহাবীদের আকীদা বাদ দিয়ে নিজের মনমতো রাসূল ﷺ এর মর্যাদা প্রণয়ন করতে গেলে সেটি চরম বেয়াদবি বৈ কিছু হবে না। একই কথা মুজিযার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

নবী করীম ﷺ এর সীরাত, আউলিয়ায়ে কিরামের জীবন ও কারামত ইত্যাদি বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আউলিয়ায়ে কিরামের কারামাত সত্য। তাই বলে পুঁথিসাহিত্য থেকে আজগুবি কল্পকাহিনী তুলে এনে বুযুর্গদের নামে চালিয়ে দেওয়ার কোনো মানে নেই। ওগুলোর আধিক্যের কারণে তাঁদের প্রকৃত খিদমাত দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। অথচ যুগে যুগে আল্লাহর ওলীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ কালিমার ছায়াতলে এসেছে। পার্থিবতাকে দূরে ঠেলে তাঁরা সবর-শুকর ও তাওয়াক্কুলের উপর জীবন পার করেছেন। এগুলোই বর্ণনা করা উচিত। আমাদের বাস্তব জীবনকে প্রভাবিত করে আউলিয়া-মুত্তাকিদের জীবনদর্শন, ত্যাগ ও লিল্লাহিয়্যাত।

তৃতীয়ত, ওয়াযের আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। বিষয় নির্ধারণ বলতে তিনটি কথা উদ্দেশ্য। যথা-

(১) বক্তাকে বক্তব্যের বিষয় নির্ধারণ করে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহ এবং দৈনন্দিন জীবনের ফরয ও নফল আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ সর্বাগ্রে প্রাধান্য পাওয়া উচিৎ। একই সাথে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও অনাচারের ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক করা এবং নব-নব ফিতনার দলীলভিত্তিক জবাব দেওয়াও ক্ষেত্রবিশেষে অনেক জরুরি। বক্তাকে কেবল সমস্যার সূচিপত্র পাঠ করে গেলেই হবে না। সমস্যা থেকে উত্তরণের উপযুক্ত পথও মানুষকে দিয়ে যাওয়া আবশ্যক।

(২) কোন বক্তাকে কী ধরণের বিষয় দেওয়া হচ্ছে, সেদিকে খেয়াল রাখা। দুটি উদাহরণ দিলে কথা পরিষ্কার হবে। ওয়ায মাহফিলে 'নারীর পর্দা' বিষয়ে প্রায়ই আলোচনা শোনা যায়। অনেক জায়গায় দেখি, কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে লোক হাসাতে পারদর্শী বক্তাকে এ ধরণের বিষয় দেওয়া হয়। অথচ পর্দা ইসলামের ফরয বিধান, যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে কুরআন শরীফের সুরা নূর ও সূরা আহযাব থেকে তাত্ত্বিক আলোচনা করার পাশাপাশি উপমা হিসেবে উম্মাহাতুল মুমিনীনের জীবনাদর্শকে তুলে ধরাই যথেষ্ট। অথচ সেদিকে না গিয়ে বক্তা নারীর চলন-বলন নকল করে দেখাতেই ব্যস্ত হয়ে যান। আবার কেউ কেউ, 'ঈমান' বিষয়ক আলোচনা শুধু তাত্ত্বিক কথাবার্তা বলে শেষ করে দেন। অথচ কিছু তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন থেকে দুতিনটি উদাহরণ দিলে মানুষ সহজেই ঈমানের হাকীকত বুঝে নিতে পারে।

(৩) গৎবাঁধা কটি বিষয় নিয়েই যুগের পর যুগ আলোচনা চালিয়ে না যাওয়া। এমন বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, যা আমাদের পূর্বসূরীরা দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সমাধান করে গেছেন। যদি ওসব বিষয়ে সম্পূরক বা অধিক শক্তিশালী আর কোনো দলীল পাওয়া যায়, তাহলে সেগুলো উপস্থাপন করা যেতে পারে। যেসব বিতর্কিত বিষয় ইতোমধ্যে সমাধান হয়ে গেছে এবং সমাজে এর প্রভাবও নেই। সেগুলোর আলোচনা কম করাই ভালো। বিতর্কিত বিষয়কে পুনরায় সামনে এনে নতুন করে মতানৈক্য তৈরি করার প্রয়োজন নেই। বরং যুগের আলোকে নতুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়কে ওয়াযের মধ্যে শামিল করা যেতে পারে।

চতুর্থত, ওয়ায মাহফিলে বক্তা যখন বক্তৃতা দেবেন, তখন তাঁর নিজের পাণ্ডিত্য নয়, বরং শ্রোতার প্রয়োজন, পর্যায় ও পারিপার্শ্বিকতাকে নযরে রেখে কথা বলা উচিৎ। ইমাম সারাখসী (র.) বলেছেন, "যদি ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান শাইবানী (র.) ছাত্রদের সামনে তাঁর নিজের মেধা অনুযায়ী কথা বলতেন, তাহলে আমরা কিছুই বুঝতে পারতাম না।" অতএব যা বলবেন, সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বলবেন। এটি রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ। আমরা আগেই বলেছি, আল্লাহ তাআলা কুরআনকে আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠতম ওয়ায হিসেবে নাযিল করেছেন, যা সব ধরণের বক্রতা ও অসঙ্গতি থেকে মুক্ত। আল্লাহ বলেছেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا

-সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তাতে কোনো বক্রতা রাখেননি। (সূরা কাহাফ, আয়াত-১)

সায়্যিদুনা আলী (রা.) বলেছেন, "মানুষকে সেভাবেই বলো, যেভাবে শুনতে তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তোমরা কি চাও যে, (তোমাদের কথার দ্বারা) তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করবে?" (সহীহ বুখারী, হাদীস-১২৭)

অতএব ওয়াইযদের প্রতি সবিনয় পরামর্শ হচ্ছে, ওয়ায-নসীহতের মূল ভিত্তি বানাতে হবে কুরআন ও সুন্নাহকে। সেই সাথে ইসলামের বাস্তবিক নমুনা হিসেবে সমপরিমাণ গুরুত্বের সাথে আসবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামের জীবন। এরপর সালফে সালিহীন, উলামা, আউলিয়া ও মুজাহিদদের জীবনাদর্শ আসবে। তবে সকল আলোচনাই তথ্যভিত্তিক ও সনদ যাচাইপূর্বক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আকীদার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সরল, সঠিক ও সুদৃঢ় আকীদার ওপর স্থির থাকা অত্যাবশ্যক। স্বপ্রণোদিত ধারণাকে কখনও আকীদার মধ্যে শামিল করা উচিৎ নয়। ওয়াযের মাঠে আকীদার আলোচনাকে ঈমানের মৌলিক বিষয়াদি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখাই যথেষ্ট। ইদানিং কিছু বক্তাকে আল্লাহর পবিত্র সত্ত্বার সাথে সম্পৃক্ত দুর্বোধ্য এবং অতি সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে জনসাধারণের সামনে আলোচনা করতে শোনা যায়। এটি উপকারী তো নয়ই, উলটো এতে মানুষের ঈমানহারা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আমাদের বুঝা উচিৎ যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উচ্চতর ইলমী দারস, খানেকার রূহানী তারবিয়াত এবং ওয়ায মাহফিলের বক্তৃতা– এ তিনটির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। কিছু জটিল ইলমী বিষয় আছে, যা সুবিজ্ঞ আলিম-উলামার সামনে বলা সাজে। কিছু সুক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিষয় আছে, যা আহলে তাসাওউফের সামনে বলা সাজে। এসব কথা সাধারণ ওয়ায মাহফিলে বললে ভয়াবহ ফিতনা সৃষ্টি হবে। তাই শ্রোতাদেরও উচিৎ নয় মাঠে-ময়দানে এমন অপ্রয়োজনীয় জটিল বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা, যা আদৌ কারও প্রয়োজন নেই। ইমাম আহমাদ (র.) বলতেন, "এমন কিছু জিজ্ঞেস করো না, যার জবাব তুমি বুঝতে পারবে না।" আবার বক্তারও উচিৎ নয় সহজ বিষয়কে পেঁচিয়ে নিজের ইলমের গভীরতা প্রকাশ করা। ইমাম ইবন আকীল (র.) বলেছেন, "এটি মোটেও কাম্য নয় যে, একজন উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন আলিম সাধারণ মানুষের সামনে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলবেন।"

ফিকহী মাসআলার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার বশবর্তী না হয়ে মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণ করাই নিরাপদ। হাদীস বর্ণনার সময় নির্ভরযোগ্য হাদীসের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। তাফসীর, ইতিহাস এবং কারও ব্যক্তিগত রচনা থেকে তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন ও তুলনামূলক যাচাই বাছাই করা জরুরি। সর্বোপরি ইসলামকে কোনো 'অতিপ্রাকৃতিক' বিষয় হিসেবে উপস্থাপন না করে মানুষের বাস্তব জীবনে আমলযোগ্য সুসংহত দ্বীন তথা জীবনব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করা চাই। এতে আমাদের শ্রম সার্থক হবে, ওয়াযের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে এবং সমাজে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

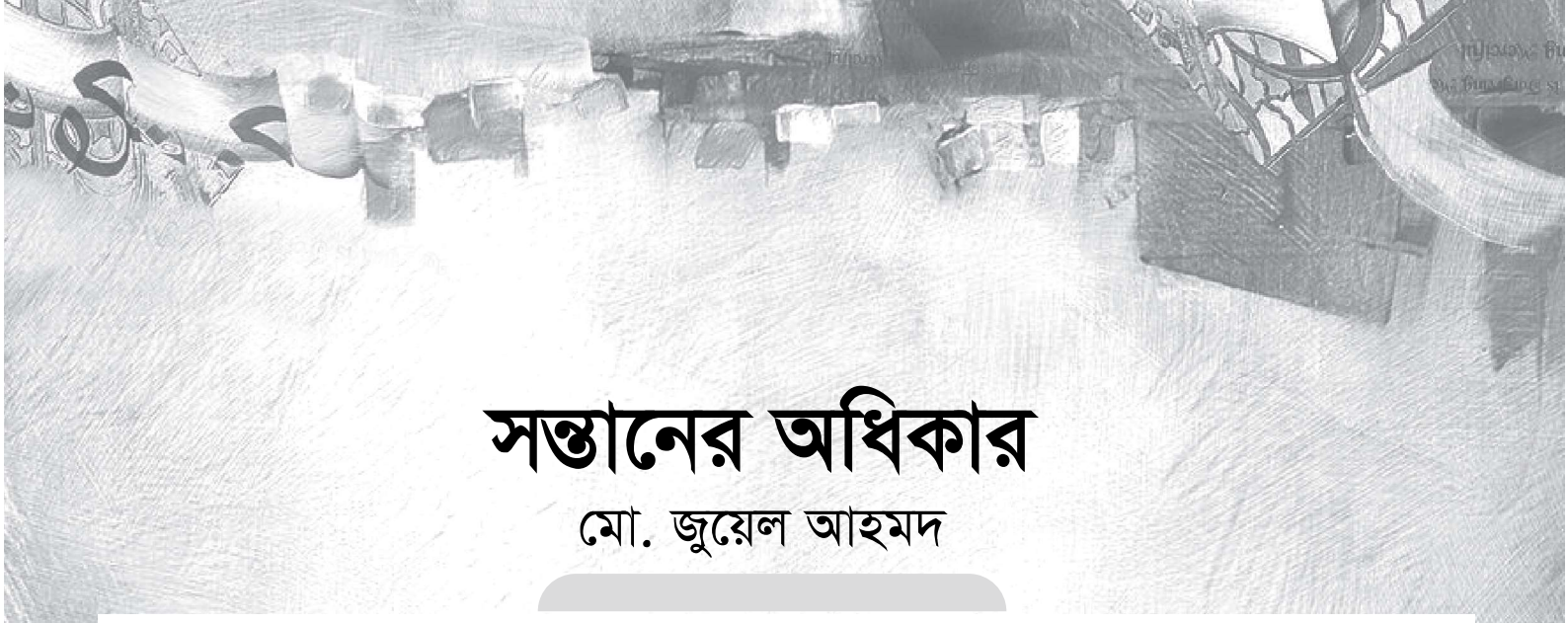

সন্তানের অধিকার

মো. জুয়েল আহমদ

আমরা সচরাচর মা-বাবার অধিকার নিয়ে আলোচনা করি, শুনি ও লেখালেখি করে থাকি। তবে আজ সন্তানের অধিকার নিয়ে লিখতে চাই। মা-বাবার জন্য যে দুআ আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন তাতে আল্লাহ সন্তানের হক সুক্ষ্মভাবে যোগ করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

-আর তুমি বলো, হে আমার প্রতিপালক! আমার মা-বাবা শৈশবে আমাকে যেভাবে লালন-পালন করেছেন আপনি সেভাবে তাঁদের প্রতি দয়া করুন। (সূরা ইসরা, আয়াত-২৪)

এখানে (كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) অর্থাৎ "আমার মা-বাবা শৈশবে আমাকে যেভাবে লালন-পালন করেছেন" এই কথাটি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় সন্তানের দুআর যোগ্য হতে হলে প্রত্যেক মা-বাবাকে শৈশবে সন্তানের হকের প্রতি যত্নবান হতে হবে। তাছাড়া সন্তানের হকের ব্যাপারে মা-বাবা জিজ্ঞাসিত হবেন। যেমন-

وَقَالَ عبد الله بن عمر لِرَجُلٍ: "أَدِّبِ ابْنَكَ، فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ، مَاذَا أَدَّبْتَهُ؟ وَمَاذَا عَلَّمْتَهُ؟ وَأَنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْ بِرِّكَ وَطَوَاعِيَتِهِ لَكَ" (رواه البيهقي/٨٩٠٥)

-হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি তোমার সন্তানকে আদব শিক্ষা দাও। কেননা তোমাকে তোমার সন্তানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি তাকে কী কী আদব ও কী কী ইলিম শিখিয়েছো? আর তোমার সন্তানকে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমার সাথে সদ্ব্যবহার করা ও তোমার আনুগত্যের ব্যাপারে। (বাইহাকী/৫০৯৮)

সন্তানের হকগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা:

১. সন্তানের জন্মের পূর্বে মা-বাবার উপর তাঁর অধিকার ২. সন্তানের জন্মের পর মা-বাবার উপর তাঁর অধিকার

সন্তানের জন্মের পূর্বে মা-বাবার উপর তাঁর অধিকার

১. মা-বাবা নিজেকে সৎ ও পবিত্র রাখা

প্রত্যেক মানুষেরই উচিত নিজের সন্তানের কল্যাণের জন্য হলেও নিজেকে সৎ ও পবিত্র রাখা। আর এটা সন্তানের একটি হক। আর এর ফলে সন্তানেরাও উপকৃত হয়। পবিত্র কুরআনে হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খাদীর (আ.) এর প্রসিদ্ধ ঘটনার একটি অংশ হলো যে, তাঁরা একটি গ্রামে গিয়েছিলেন এবং সেখানে খাবার চাইলে তাঁদের খাবার দেওয়া হয়নি তথা মেহমানদারী করা হয়নি, অথচ ঐ দুই ইয়াতিম বালকের সম্পদ যেন সুরক্ষিত থাকে সেজন্য তাঁরা দেয়াল ঠিক করে দিয়েছিলেন যার নিচে গুপ্তধন ছিল। আর এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا অর্থাৎ তাঁদের পূর্বপুরুষ সৎ ছিলেন। তাফসীরের কিতাবে এসেছে, এই আয়াতে 'তাদের পিতা' বলতে তাদের 'সপ্তম পূর্বপুরুষ' যিনি ছিলেন তাঁকে বুঝানো হয়েছে, যিনি নেককার ছিলেন। তাফসীরের কিতাবে এসেছে- "তাহলে মা-বাবা সৎ থাকলে তাদের পরবর্তী সপ্তম প্রজন্মও যে উপকৃত হতে পারে তা পবিত্র কুরআন থেকে প্রমাণিত। কেননা ইয়াতিম দুই বালকের বাবা ছিলেন তাদের সপ্তম পূর্বপুরুষ।" (তাফসীরে মুনীর)

২. নেককার স্বামী-স্ত্রী বাছাই করা

প্রত্যেক মানুষেরই উচিত বিবাহের সময় এই বিষয় খেয়াল রাখা যে, আমি যাকে বিয়ে করছি আল্লাহ চাইলে সে আমার সন্তানের মা বা বাবা হবে, সুতরাং আমার সন্তানের জন্য একজন ভালো মা বা বাবা হতে পারে এমন কাউকেই বিবাহ করব। যেমন- হযরত আবুল আসওয়াদ আদ দুওয়ালী তাঁর সন্তানদের বলতেন, (আমার সন্তানেরা শুনো) 'আমি তোমাদের প্রতি শৈশব থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত তো ইহসান করেছিই এমনকি তোমাদের জন্মের পূর্বেও তোমাদের প্রতি ইহসান করেছি। সন্তানরা বলল, (বাবা) আমাদের জন্মের পূর্বে কীভাবে আমাদের প্রতি ইহসান করলেন? তিনি জবাবে বললেন, তোমাদের জন্য এমন মা বাছাই করেছি যার কারণে তোমাদেরকে কেউ কোনো দিন মন্দ বলার সুযোগ পাবে না।'

আর বিবাহের ক্ষেত্রে তো নবী ﷺ নির্দেশনা দিয়েই রেখেছেন, হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ (متفق عليه)

-চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদের বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারী। সুতরাং তুমি দ্বীনদারীতাকেই প্রাধান্য দিবে নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। (বুখারী, হাদীস-৫০৯০; মুসলিম, হাদীস-১৪৬৬)

হাদীসে নারীকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে তার চারটি বৈশিষ্ট্য দেখতে বলা হয়েছে। যথা- ধন-সম্পদ, বংশীয় মর্যাদা (সামাজিক মর্যাদা), সৌন্দর্য ও ধার্মিকতা। তবে ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়টি ছেলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৩. সুন্নাহ অনুসরণ করে স্বামী-স্ত্রী একত্রিত হওয়া

সুন্নাহ অনুসরণ না করে যখন স্বামী-স্ত্রী একত্রিত হন আর সেই মিলনে যদি সন্তান হয় তাহলে শয়তান সেই সন্তানের ক্ষতি করার সম্ভাবনা থাকে। তাই মা-বাবার উচিত সন্তানের কল্যাণের জন্য সুন্নাহ অনুসরণ করা। যেমন হাদীসে এসেছে, হযরত ইবন আব্বাস

(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ، وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَرُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ. (رواه البخاري/١٧٢٣)

-তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর কাছে আসে এবং বলে, "বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ শাইতানা মা রাজাকতানা" আর সেই মিলনে যদি তাঁদেরকে সন্তান দেওয়া হয়, তাহলে শয়তান ঐ সন্তানের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী, হাদীস-৩২৭১)

৪. আল্লাহর কাছে নেক সন্তানের জন্য দুআ করা

সন্তানের জন্মের পূর্ব থেকেই মা-বাবার উচিত নেক সন্তানের জন্য দুআ করা। যেমন- আমরা কুরআনে কারীম থেকে এখানে দুইটি দুআ উল্লেখ করছি।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (الفرقان : ٧٤)

-হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে চোখ জুড়ানো জীবনসঙ্গী এবং সন্তানাদী দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দিন। (সূরা ফুরকান, আয়াত-৭৪)

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (آل عمران : ٣٨)

-হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার পক্ষ থেকে নেককার সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দুআ শ্রবণকারী। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৩৮)

৫. মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সন্তানের হক

সন্তান যখন মায়ের গর্ভে থাকে তখন মায়ের উচিত নিজেকে সবসময় ভালো কাজে নিয়োজিত রাখা এবং শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি নযর রাখা। মায়ের গর্ভে সন্তান থাকা অবস্থায় মায়ের কার্যকলাপের প্রভাব সন্তানের উপর হয়ে থাকে, তাই মা ঐ সময় সন্তানের কল্যাণের জন্য নিজেকে ভালো আমলে নিয়োজিত রাখা উচিত।

সন্তানের জন্মের পর মা-বাবার উপর তাঁর অধিকার

১. সন্তানের ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দেওয়া

সন্তান জন্মের পর তার ডান কানে আযান দেওয়া ও বাম কানে ইকামত দেওয়া সুন্নাত। হাদীসে এসেছে,

হযরত আবূ রাফি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ফাতিমা (রা.) হাসান (রা.) কে জন্ম দিলেন তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখেছি যে, তিনি হাসান (রা.) এর কানে সালাতের আযানের মতো আযান দিলেন। (তিরমিযী, হাদীস-১৫১৪)

নবী ﷺ বলেছেন, যার কোনো সন্তান জন্ম নিল অতঃপর তার ডান কানে আযান দিল এবং বাম কানে ইকামত দিল তাহলে তার থেকে উম্মুস সাবিয়্যাতকে (খারাপ জিন/শয়তান) দূরে রাখা হয়। (শুআবুল ঈমান, হাদীস-৮২৫৪)

২. সন্তানের জন্য তাহনীক ও দুআর ব্যবস্থা করা

সন্তানের জন্মের পর তার জন্য তাহনীক করা ও দুআ করা সুন্নাত। তাহনীক হলো মিষ্টি জাতীয় কোন কিছু চিবিয়ে সন্তানের মুখে দেওয়া। এক্ষেত্রে উত্তম হলো খেজুর চিবিয়ে দেওয়া। আর খেজুর না পেলে মিষ্টি জাতীয় কিছু সন্তানের মুখে দেওয়া। যেমন হাদীসে এসেছে,

হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে (সদ্যোজাত) শিশুদের নিয়ে আসা হতো, আর তিনি তাঁদের জন্য বরকতের দুআ করতেন এবং তাঁদেরকে তাহনীক করতেন। (মুসলিম, হাদীস-১০১)

হযরত আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার এক পুত্র সন্তান জন্ম নিল, আমি তাঁকে নিয়ে নবী ﷺ এর কাছে আসলাম। আর তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম। অতঃপর তিনি একটি খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন আর তার জন্য বরকতের দুআ করে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। (বুখারী, হাদীস-৫৪৬৭)

৩. সন্তানের জন্য সুন্দর নাম বাছাই করা

সন্তানের জন্য সুন্দর নাম রাখা এটা হলো সন্তানের অন্যতম অধিকার। হাদীসে এসেছে, হযরত আবূ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ. (رواه أبو داود)

-কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নাম ও তোমাদের বাবার নাম ধরে ডাকা হবে। অতএব তোমরা তোমাদের নামগুলোকে সুন্দর করে রাখ। (আবূ দাউদ, হাদীস-৪৯৪৮)

হযরত ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ. (رواه مسلم)

-নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। (মুসলিম, হাদীস-২১৩২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا سَمَّيْتُمْ فَعَبِّدُوا. (المعجم الكبير للطبراني)

-যখন তোমরা নাম রাখবে তখন আবদযুক্ত করে নাম রাখ। (অর্থাৎ আল্লাহর নামের সাথে আবদ যুক্ত করে নাম রাখ। যেমন আব্দুর রহীম, আব্দুল মালিক ইত্যাদি)। (তাবারানী, হাদীস-৩৮৩)

৪. আকীকা করা

সন্তানের জন্মের ৭ম বা ১৪ তম বা ২১ তম দিনে ছেলে হলে দুইটি বকরি আর মেয়ে হলে একটি বকরি আল্লাহর নামে যবেহ করে সন্তানের মাথার চুল মুন্ডন করাকে আকীকা বলে। যাদের সামর্থ আছে তাদের উচিত সন্তানের কল্যাণের জন্য আকীকা করা। কেননা আকীকার কারণে সন্তানকে আল্লাহ বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন এবং এতে করে সন্তান লাভের পর মা-বাবার পক্ষ থেকে শুকরিয়ারও বহিঃপ্রকাশ হয়। আকীকা সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,

وَعَنْ عَائِشَةَ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» (رواه الترمذي/١٥١٣)

-হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে আদেশ করেছেন ছেলের পক্ষ থেকে একই ধরনের দুইটি ও মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরি আকীকা করতে। (তিরমিযী, হাদীস-১৫১৩)

৫. সন্তানের মাথার চুল মুন্ডন করা ও চুলের ওযন পরিমাণ রৌপ্য সাদকাহ করা

عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه» (رواه الترمذي)

-হযরত সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সকল শিশুই তার আকীকার সাথে বন্ধক (দায়বদ্ধ) অবস্থায় থাকে। জন্মগ্রহণ করার সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে যবেহ করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে এবং তার মাথা ন্যাড়া করতে হবে। (তিরমিযী, হাদীস-১৫২২)

عن علي بن أبي طالب قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال: «يا فاطمة، احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة»، قال: فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم (رواه الترمذي/١٥١٩)

-হযরত আলী ইবন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসানের

আকীকা করলেন এবং বললেন, হে ফাতিমা, তার মাথা ন্যাড়া করে দাও এবং তার চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য দান কর। তদানুযায়ী আমি তার চুল ওযন করলাম আর ইহার ওযন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি ছিল। (তিরমিযী, হাদীস-১৫১৯)

৬. দুধ পান করানো

সন্তানের জন্মের পর তাকে দুই বছর দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করা মা-বাবার কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ .....إلخ (سورة البقرة : ٣٣٢)

-আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে। (সূরা বাকারা, আয়াত-২৩৩)

৭. আদর করা

সন্তানকে আদর-স্নেহে লালন-পালন করাও মা-বাবার অন্যতম কর্তব্য। হাদীসে এসেছে,

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ইবন আলীকে চুম্বন করলেন। ঐ সময় তাঁর নিকট আকরা বিন হাবিস তামীমী (রা.) বসা ছিলেন। তখন আকরা বললেন, আমারতো দশ সন্তান আছে অথচ আমি তাঁদের কখনো চুম্বন করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে তাকালেন এবং বললেন, যে দয়া করে না তাকে দয়া করা হয় না। (বুখারী, হাদীস-৫৯৯৭)

৮. সন্তানের জন্য বদদুআ না করা

সন্তানের কোনো আচরণে মা-বাবা রাগ করে বদদুআ করা উচিত নয়, কারণ এতে সন্তান চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. (رواه الترمذي/٥٠٩١)

-তিনজনের দুআ সন্দেহাতীতভাবে কবূল হয়: (১) মাযলুমের দুআ (২) মুসাফিরের দুআ (৩) সন্তানের জন্য মাতা-পিতার বদদুআ। (তিরমিযী, হাদীস-১৯০৫)

৯. সন্তানকে আদব ও জ্ঞান শেখানোর ব্যবস্থা করা

সন্তানের যতগুলো হক রয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তাকে ইসলামের মৌলিক আদব ও ইলম শিক্ষা দেওয়া। আর এই শিক্ষাদানের বিষয়টি সাদাকা করার চেয়েও ফদীলতপূর্ণ।

হযরত জাবির বিন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের সন্তানদেরকে আদব শিক্ষা দেওয়া প্রতিদিন মিসকীনদের অর্ধ 'সা' দান করার চেয়ে উত্তম। (তাবারানী, হাদীস-২০৩২)

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তারা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ, মা-বাবার হক কী কী আমরা জানি। তবে সন্তানের হক কী কী? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (সন্তানের হক হলো) তার সুন্দর নাম রাখা এবং তাকে আদব শিক্ষা দেওয়া। (শুআবুল ঈমান, হাদীস-৮২৯১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে ছোটদের শিক্ষা দিতেন তা নিম্নোক্ত হাদীস থেকে জানা যায়, হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পেছনে ছিলাম, তখন তিনি বললেন, হে বালক, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কিছু বিষয় শিক্ষা দিচ্ছি (আর তা হলো), তুমি আল্লাহ তাআলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে তাহলে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে তাহলে তুমি তাঁকে কাছে পাবে। তোমার কোনো কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহর কাছে চাও। সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহর কাছেই করো। জেনে রাখো, যদি জাতির সকল লোকই তোমার কোনো উপকার করতে চায় তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। যদি জাতির সকল লোকই তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। (তিরমিযী, হাদীস-২৫১৬)

১০. নামায শিক্ষা দান

সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই নামায আদায়ে অভ্যস্ত করা মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

হযরত আমর বিন শুয়াইব তিনি তার বাবা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে নামাযের শিক্ষা দাও এবং দশ বছর বয়সে এর জন্য প্রহার করবে (যদি নামায না পড়ে) এবং তোমাদের সন্তানদের বিছানা পৃথক করে দিবে। (আবূ দাউদ, হাদীস-৪৯৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে তাঁর নাতনী উমামা বিনতে যাইনাব (রা.) কে নিয়ে নামায পড়তেন, হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মেয়ে যাইনাব ও আবুল আস বিন রবির ঔরসজাত সন্তান উমামা বিনতে যাইনাব (রা.) কে কাঁধে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন সিজদায় যেতেন তখন তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে দিতেন। আর যখন দাঁড়াতেন তাকে কাঁধে তুলে নিতেন। (বুখারী, হাদীস-৫১৬)

এমনিভাবে সন্তানকে দ্বীনের সঠিক আকীদা ও আমলের শিক্ষা দেওয়া বা এর ব্যবস্থা করা মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

১১. বিবাহের ব্যবস্থা করা

সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার বিবাহের ব্যবস্থা করে দেওয়াও মা-বাবার দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবূ সাঈদ (রা.) ও ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার সন্তান জন্ম নিল সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে ও তাকে আদব শিক্ষা দেয়। অতঃপর যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয় তখন যেন তাকে বিয়ে করিয়ে দেয়। যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর বিয়ে না করিয়ে দেয় আর সে যদি গুনাহ করে তাহলে তার গুনাহ বাবার উপর বর্তাবে। (বাইহাকী, হাদীস-৮২৯৯)

১২. সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা

একাধিক সন্তান হলে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা মা-বাবার জন্য আবশ্যক।

হযরত নুমান বিন বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে আদল (সমতা) বজায় রাখো, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে আদল (সমতা) বজায় রাখো। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস-১৮৪২০)

হযরত নুমান বিন বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত অপর হাদীস, তিনি বলেন, তার বাবা তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে নিয়ে এলেন এবং বললেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ), আমি আমার এই ছেলেকে আমার একটি গোলাম দান করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি তোমার প্রত্যেক ছেলেকে এই রকম দান করেছ ? তিনি বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তোমার দান ফিরিয়ে নাও। মুসলিমের বর্ণনায় আছে, আল্লাহকে ভয় করো, সন্তানদের মধ্যে আদল (সমতা) বজায় রাখো। অতঃপর আমার বাবা ঐ সাদাকা ফিরিয়ে নিলেন। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

প্রিয় পাঠক, আপনি যদি আপনার অনুগত সন্তান চান তাহলে তাঁর দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে। নিজের সন্তানকে শরীআত নির্দেশিত পন্থায় গড়ে তুলুন। ইসলাম সন্তানের যে অধিকার দিয়েছে তা যথাযথভাবে আগে নিজে আদায় করুন তাহলে সন্তান আপনার অনুগত হবেই ইন শা আল্লাহ।

ঘুমানোর পূর্বাপর সুন্নাতে নববী ﷺ

মোহাম্মদ আখতার হোসাইন

আলোকিত জীবন গঠনে চাই, সুন্নাতে নববী অনুসরণ। ঘুম মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য অপরিমেয় রহমত। এটা বান্দার সকল ক্লান্তি দূরীভূত করে দিনের বেলা একটি সুস্থ সবল মস্তিষ্ক নিয়ে কর্ম পরিচালনার শক্তি যোগায়। আর মানুষ অনিদ্রার কারণে শারীরিক এবং মানসিক বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। বিশেষ করে স্নায়ু দুর্বল হয়ে যায় এবং মানুষের স্মৃতি শক্তি অতি লোপ পায়। পরিমিত ঘুম যেমনিভাবে সুন্নাতে নববীর দৃষ্টিতে অতি জরুরি ঠিক তেমনিভাবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অতি প্রয়োজন। যার ত্রুটিতে মানব দেহে অনেক ব্যাধি সৃষ্টি হয়। নিম্নে সুন্নাতে নববীর আলোকে ঘুমের পূর্বাপর করণীয় দিকগুলো আলোকপাত করা হলো।

ঘুমের অপরিহার্যতা প্রদানে ঐশীবাণী

মানব জীবনে ঘুমের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একজন মানুষের শারীরিক সুস্থতা নির্ভর করে তার সুপরিমিত নিদ্রায়। এর প্রতি গুরুত্ব প্রদানে মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কালামে হাকীমের মধ্যে ইরশাদ করেন,

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

-তিনিই তো তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন বাইরে গমনের জন্য।[১]

নিদ্রা যাওয়ার পূর্বাক্ষণে আমাদের যা করণীয়

রাসূলে আরাবী ﷺ ছিলেন উম্মতের একজন আদর্শ শিক্ষক। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন নিদ্রা যাওয়ার পূর্বাপর করণীয় এবং ঘুমানোর সর্বোত্তম পদ্ধতি। নিম্নে করণীয় দিকসমূহ উল্লেখ করা হলো-

১. ঘুমানোর পূর্বে নামাযের ন্যায় অযু করে নিবে:

হাদীসে নববীর দৃষ্টিতে অযুর গুরুত্ব ও ফদীলত অপরীসিম। রহমতে আলম ﷺ সর্বাবস্থায় অযুসহ থাকতেন এবং নিদ্রা যাওয়ার সময় উযূ করে নিতেন, এ মর্মে হযরত বারা ইবন আযিব (রা.) বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ আমাকে বললেন,

إِذَا أَتَيْتَ مَشْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوْئَكَ لِلصَّلَاةِ–

-যখন তুমি শোয়ার বিছানায় যেতে চাও, তখন তুমি নামাযের অযুর ন্যায় অযু করবে।[২]

২. দাঁত পরিষ্কার করে নিবে:

ঘুমানোর পূর্বে আমাদের উচিত মুখ পরিষ্কার করে নেওয়া। কারণ, দাঁতের ফাঁকে খাবারের কণা আটকে থাকে এবং বিভিন্ন রোগব্যাধি সৃষ্টি করে। মিসওয়াক বা ব্রাশের মাধ্যমে মুখ পরিষ্কার করা হলে তা দূর হয়ে যায়। নবীজি ﷺ ঘুমের পূর্বে ও পরে মিসওয়াক করতেন। যদি কেউ দাঁত পরিষ্কারের জন্যে বর্তমান আধুনিক ব্রাশ ব্যবহার করে তবে একটি সুন্নাত আদায় হবে। কেবলমাত্র দাঁত পরিষ্কার করার সুন্নাত আদায় হবে। আর যদি মিসওয়াক করে তাহলে দুইটি সুন্নাত আদায় হচ্ছে, একটি নবীজির সুন্নাত হিসেবে মিসওয়াকের ব্যবহার আর অপরটি দন্ত পরিষ্কার।

৩. বিছানা পরিষ্কার করে নিবে:

ঘুমাতে যাওয়ার আগে বিছানা পরিষ্কার করে নেওয়া উচিৎ। কারণ, বিছানায় ক্ষতিকর কিছু পড়ে থাকতে পারে। তাছাড়া ময়লা আবর্জনায় রাত যাপন করা স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি বিছানায় যায় তখন সে যেন, তার লুঙ্গির ভেতরের দিক দিয়ে নিজ বিছানাটা ঝেড়ে নেয়। কারণ, সে জানেনা যে, বিছানার উপর তার অনুপস্থিতিতে পীড়াদায়ক কোন কিছু আছে কিনা।[৩]

৪. হাতের চর্বি বা ময়লা পরিষ্কার করে নিবে:

রাতে শোয়ার আগে হাতে তৈল চর্বি বা ময়লা লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করে নেবে। হাতে চর্বি লেগে থাকা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এর কারণে কাঁথা, বালিশ ও বিছানা চাদর ময়লা হয়ে যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি চর্বিমাখা হাতে রাত যাপন করল এবং তা ধুয়ে পরিষ্কার করল না, কোন বিপদ ঘটলে সে যেন নিজেকে ছাড়া কাউকে দোষারোপ না করে।[৪]

৫. চোখে সুরমা ব্যবহার করবে:

রহমতে আলম ﷺ ঘুমানোর পূর্বক্ষণে কতিপয় আমল করতেন, এর মধ্যে অন্যতম আমল হচ্ছে; নিদ্রা যাওয়ার পূর্বক্ষণে উভয় চোখে সুরমা ব্যবহার করা। এ মর্মে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা ইসমিদ সুরমা ব্যবহার করো। কেননা তা চোখের ভ্রু গজায়। তিনি (সাহাবী) বলেন, নবীজির একটি সুরমাদানী ছিল। তা থেকে তিনি ডান ও বাম চোখে প্রত্যেকদিন রাত্রে তিনবার করে দিতেন।[৫]

নিদ্রাকালে আমাদের যা করণীয়

রাসূলে আরাবী ﷺ নিদ্রা যেতে কতিপয় দুআ পাঠ করতেন এবং সাহাবীগণকেও পাঠে অভ্যস্থ করতেন, নিম্নে শয়নকালের কয়েকটি আমল পেশ করছি।

১. ঘুমানোর পূর্বক্ষণে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আমল:

নবীজির জলীলুল কদর সাহাবী হযরত আলী (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ এমন সময় আমাদের গৃহে আসলেন, যখন আমরা বিছানায় শোয়ে পড়েছিলাম। তাঁকে দেখে আমি উঠে বসতে চাইলাম। কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় থাক এবং তিনি আমাদের মাঝে এমনভাবে বসে পড়লেন, যেন আমি তাঁর দুই পায়ের শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করলাম। তিনি বললেন, তোমরা যা চেয়েছিলে, আমি কি তার চেয়েও উত্তম জিনিস শিক্ষা দিব না? তখন নবীজি ﷺ বললেন,

إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ، وَ تُسَبِّحَا ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِيْنَ وَتَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ–

-তোমরা যখন ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় যাবে, তখন চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার, তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ পড়ে নিবে। এটা খাদিম অপেক্ষা অনেক উত্তম।[৬]

হাদীসের গল্প ও আমাদের শিক্ষা

নিদ্রা যাওয়ার সময় আয়াতুল কুরসি পাঠের মহত্ত্ব ও ফদীলত সম্পর্কে রাসূলে আরাবী ﷺ এর একটি দীর্ঘ হাদীস এখানে প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করছি। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি আমাকে রামাদানের যাকাত হিফাযত করার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এক ব্যক্তি এসে অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগলো। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর কাছে উপস্থিত করব। সে বলল, আমাকে

ছেড়ে দিন। আমি খুব অভাবগ্রস্ত, আমার যিম্মায় পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে এবং আমার প্রয়োজন তীব্র। তিনি বললেন, আমি ছেড়ে দিলাম। যখন সকাল হলো, তখন রাসূলে কারীম ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ হুরাইরা! তোমার রাতের বন্দী কী করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তার তীব্র অভাব ও পরিবার-পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়, তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ এর এ উক্তির কারণে আমি বুঝতে পারলাম যে সে পুনরায় আসবে। কাজেই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। সে এলো এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল আমাকে ছেড়ে দিন। কেননা আমি খুবই দরিদ্র এবং আমার উপর পরিবার পরিজনের দায়িত্ব ন্যাস্ত। আমি আর আসব না। তার প্রতি আমার দয়া হল এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হলে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরাইরা! তোমার বন্দী কী করলে? আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! সে তার তীব্র প্রয়োজন পরিবার-পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, খবরদার সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। তাই আমি তৃতীয়বার তার অপেক্ষায় রইলাম। সে আবার আসল এবং অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর কাছে অবশ্যই নিয়ে যাব। এ হলো তিনবারের শেষবার। তুমি প্রত্যেকবার বলো যে, আর আসবে না, কিন্তু আবার আসো। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব। যা দিয়ে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম, সেটা কি? সে বলল, যখন তুমি রাতে শয্যায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসি (اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) আয়াতের শেষ অংশ পর্যন্ত পড়বে। তখন আল্লাহর তরফ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। কাজেই তাকে আমি ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, গত রাতে তোমার বন্দী কী করল? আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! সে আমাকে বলল যে, সে আমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিবে যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। তিনি আমাকে বললেন, এই বাক্যগুলো কী? আমি বললাম সে আমাকে বলল, যখন তুমি তোমার বিছানায় ঘুমাতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী (اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) প্রথম হতে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে এবং সে আমাকে বলল এতে আল্লাহর তরফ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে এবং ভোর পর্যন্ত তোমার নিকট শয়তান আসতে পারবে না। সাহাবায়ে কিরাম কল্যাণের জন্য বিশেষ লালায়িত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, এ কথাটি তো সে তোমাকে সত্য বলেছে। কিন্তু সাবধান, সে মিথ্যুক। হে আবু হুরাইরা! তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথা বলছ তুমি কি জান ? আবূ হুরাইরা (রা.) বললেন, না। তিনি বললেন সে ছিলো শয়তান।[৮]

২. শোয়ার পদ্ধতি:

আদব হলো ডান কাতে ঘুমানো আর রহমতে আলম ﷺ এভাবেই ঘুমাতেন। প্রয়োজনে চিৎ হয়েও ঘুমানো যায়। কিন্তু উপুড় হয়ে ঘুমানো উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ থেকে নিষেধ করেছেন। হযরত আবু উমামা (রা.) বলেন, একদা নবী করীম ﷺ এমন ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যে উপুড় হয়ে ঘুমিয়েছিল। তিনি তাকে পা দ্বারা ঠুকলেন এবং বললেন, ওহে! ওঠো, এটা জাহান্নামীদের শয়ন।[৯]

৩. নিদ্রা যাওয়ার ক্ষণে যে দুআটি পড়তে হয়:

হুজুরে আকরাম ﷺ যখন নিদ্রা যেতেন, তখন কতিপয় দুআ পাঠ করতেন। হযরত হুযাইফা ইবন ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত, রহমতে আলম ﷺ যখন বিছানায় যেতেন, তখন এ দুআ পাঠ করতেন,

أَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

-হে আল্লাহ! আপনারই নাম নিয়ে মৃত্যুবরণ করি (ঘুমাই) আর আপনার নাম নিয়েই জীবিত হই।

আর যখন তিনি জাগ্রত হতেন, তখন তিনি বলতেন,

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَا نَفْسِيْ بَعْدَمَا أَمَاتَهَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْر

-সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন, আর তার দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।[১০]

লক্ষণীয়, তবে বুখারী ও মুসলিম শরীফসহ আরো অন্যান্য কিতাবের মধ্যে অন্য শব্দেও দুআটি এভাবে এসেছে।

৪. বিছানায় অবস্থানকালে নবীজি যে দুআটি পড়তেন

নবীজি নিদ্রাকালে বিছানায় যেতেন তখন অনেকগুলো দুআ পাঠ করতেন। তার মধ্যে অন্যতম একটি দুআ হলো, আয়িশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ প্রতি রাতে শোয়ার জন্য তাঁর বিছানায় এসে দু'হাত একত্র করে 'কুল হুআল্লাহু আহাদ', 'কুল আউযুবি রাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযুবি রাব্বিন নাস' সূরা তিনটি পড়ে (হাতে) ফুঁক দিতেন, অতঃপর সেই হাত দুটো দিয়ে যতদূর সম্ভব তাঁর শরীর মাসেহ করতেন এবং মাথা থেকে মাসেহ শুরু করতেন, তারপর মুখমন্ডল, শরীরের সম্মুখভাগ, অতঃপর শরীরের যেখানে যেখানে হাত পৌঁছানো সম্ভব। তিনি এরূপ তিনবার করতেন।[১১]

৫. ডান কাঁধে ও হাতের তালুর উপর ঘুমানো:

উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.) বলেন, নবীজি যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন ডান হাতের তালু ডান গালের নিচে রাখতেন এবং এই দুআটি তিনবার পাঠ করতেন।

أَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ يَوْمَ تَبْعَثُ ثَلَاثَ مَرَّارٍ–

-হে আমার প্রভু! যে দিন আপনার বান্দাদেরকে পুনর্জীবিত করবেন সে দিনের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করুন।[১২]

নিদ্রা থেকে জাগার পর আমাদের যা করণীয়

আল্লাহ তাআলা নিদ্রাকে মানব জাতির জন্য রহমত হিসেবে দান করেছেন, এটা হচ্ছে মানুষের কষ্ট ক্লেশ দূর করে প্রশান্তি লাভের উপায়। ঘুমানোর পূর্বে যেমনিভাবে কিছু সুন্নাতে নববী রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে নিদ্রা থেকে উঠার পরেও কয়েকটি সুন্নাত রয়েছে। নিম্নে তা পেশ করা হলো-

১. জাগ্রত হওয়ার দুআ

হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রহমতে আলম ﷺ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন তখন এ দুআ পাঠ করতেন-

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْر–

-সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের মৃত্যুর পরে জীবিত করেছেন এবং তাঁর কাছেই আমাদের একত্রিত হতে হবে।[১৩]

২. হাত-মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথেই রহমতে আলম ﷺ দুআ পড়ে নিতেন, তারপর ধারাবাহিকভাবে সমস্ত কার্যাবলি সম্পাদন করতেন, বিশেষ করে জাগ্রত হওয়ার পর উভয় হাত ধৌত করতেন। এ মর্মে হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রহমতে আলম ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে সে যেন তার হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত পানিতে না ঢুকায়। কেননা তোমাদের কারো জানা নেই যে, তার হাত রাতে কোথায় পৌঁছে ছিলো।[১৪]

মহান আল্লাহ তাআলা যেন, আমাদের সবাইকে জীবনের প্রতিটি ধাপে তাঁর হুকুম ও রহমতে আলম ﷺ এর পুণ্য ও বরকতময় জীবন অনুসরণ করে চলার তওফীক দান করেন।

১। সূরা ফুরকান, আয়াত ৪৭; ◆ ২। সহীহ বুখারী, হা. ৬৩১১; ◆ ৩। সহীহ বুখারী, হা. ৬৩২০; সুনান আদ দারিমী, হা. ২৭২৬; ◆ ৪। সুনান আবূ দাউদ, সুনান আত তিরমিযী; ◆ ৫। সুনান আত তিরমিযী, হা. ১৭৫৭; ◆ ৬। সহীহ বুখারী, হা. ৩৭০৫; ◆ ৭। সহীহ বুখারী, হা. ২৩১১;◆ ৮। ইবন মাজাহ, হা. ৮৫৩৭; ◆ ৯। সুনান আত তিরমিযী, হা. ৩৪১৭; ◆ ১০। সুনান আবূ দাউদ, হা. ৫০৫৬; ◆১১ সুনান আবূ দাউদ, হা.৫০৪৫; আশরাফুল ওসায়েল, হা. ২৪৪, পৃ.৩৬৫; ◆ ১২। সহীহ বুখারী, হা. ৬৩১২; ◆ ১৩। সুনান আন নাসাঈ, হা. ১;

কালাম শাস্ত্রের উদ্ভাবন ও ক্রমবিকাশ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

আব্দুল্লাহ জারীর

দর্শন আর যুক্তির নিরিখে ইসলামের সঠিক আকীদার পক্ষে দলীল-প্রমাণ আলোচনার শাস্ত্রকে কালাম শাস্ত্র বলা হয়। আর এ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ উলামাদেরকে "মুতাকাল্লিম" বলে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ শাস্ত্রটি বর্তমান পর্যায়ে ছিল না, বরং অন্যান্য ইসলামী শাস্ত্রের মতো এটিও সময়ের প্রয়োজনে উদ্ভাবিত হয়েছে। এ শাস্ত্রের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে ইবন খালদুন তার আল-মুকাদ্দিমায় বলেন, "কালামশাস্ত্র হল বুদ্ধিভিত্তিক দলীলের মাধ্যমে ইসলামী আকীদা প্রমাণের স্বপক্ষে যুক্তিপ্রদান করা এবং আহলে সুন্নাহ এবং সালাফের আকীদা বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত মতদর্শীদের বিশ্বাসসমূহকে যৌক্তিক দলীল দ্বারা খণ্ডন করা।"

কালাম শাস্ত্রের উপরোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, এ শাস্ত্রের দুটি উদ্দেশ্য। একটি হল, সালাফে সালেহীন থেকে প্রমাণিত আকীদা বিশ্বাসকে যৌক্তিক দলীলের মাধ্যমে প্রমাণ করা এবং অপরটি হল, সঠিক আকীদা বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত বিভিন্ন বাতিল দলের মতবাদসমূহকে বুদ্ধিভিত্তিক দলীলের মাধ্যমে খণ্ডন করা।

এখানে কালাম শাস্ত্রের মৌলিক দুটি আলোচ্য বিষয় সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরা হয়েছে, অতএব যে সকল মুসলিম মনীষী উপরোক্ত দুই উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখে দর্শনচর্চা করেননি বা এ উদ্দেশ্যে দর্শনের আলোচনা করেননি তাদেরকে "মুতাকাল্লিম" বা "কালামবিদ" বলা হয়না। সুতরাং জন্মসূত্রে মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে ইবন সীনা, ফারাবী, কিন্দি প্রমূখ যারা নিরেট দর্শনচর্চা করেছেন তাদেরকে "মুতাকাল্লিম" বা "কালামবিদ" বলা হয়না, কেবলই দার্শনিক বলা হয়। কেননা তাদের দর্শনচর্চার পিছনে সালাফের আকীদার দলীল উপস্থাপন ও ভ্রান্ত আকীদা খণ্ডনের উদ্দেশ্য বিদ্যমান ছিল না, বরং ক্ষেত্রবিশেষ উলটো তারা বিজাতীয় দর্শনের প্রভাবে ভ্রান্ত আকীদা লালন করতেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মুতাকাল্লিম উলামায়ে কিরাম দার্শনিক যুক্তির মাধ্যমে ইসলামী আকীদা প্রমাণ করে সেই প্রমাণের ভিত্তিতে তারা ঈমান এনেছেন- তা কিন্তু নয়। বরং তারা কুরআন-হাদীসের আলোকে সালাফের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন, এবং বিজাতীয় দর্শনের প্রভাবে বিশুদ্ধ আকীদার বিরুদ্ধে কোন কোন দার্শনিক অবস্থান গ্রহণ করলে তাদের অস্ত্র তথা দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যেই তাদেরকে যেন প্রতিহত করা যায়, কেবল এ জন্য মুতাকাল্লিমগণ কালামী দর্শনের চর্চা করেছেন।

এ প্রবন্ধে কালাম শাস্ত্রের আগে কীভাবে আকীদাচর্চা করা হতো, কেন কালাম শাস্ত্রের উদ্ভব হলো, কালামী ধারার আকীদার কিতাব এবং কালাম শাস্ত্রে পূর্বের আকীদার কিতাবসমূহের আলোচনার পদ্ধতি কেমন ছিল, এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে কালামী ধারা উদ্ভাবনের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী আকীদার গ্রন্থগুলো সাধারণত নিরেট আকীদা এবং সাথে সাথে কুরআন এবং হাদীসের দলীল উল্লেখ থাকতো, কিন্তু দার্শনিক যুক্তির উল্লেখ থাকতো না বললেই চলে। উদাহরণস্বরূপ ইমাম তাহাবী (মৃত্যু: ৩২১ হিজরী) কর্তৃক রচিত "আকীদাতুত তাহাবী" তে তিনি মৌলিক আকীদা উল্লেখ করেছেন কিন্তু তার পাশাপাশি যুক্তিভিত্তিক দলীল উল্লেখ করেননি। যেমন তিনি তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন: "মহান আল্লাহকে ছয় দিকের কোনো দিক বেষ্টন করেনা" কিন্তু তিনি এ আকীদার পিছনে কোনো যুক্তিভিত্তিক দলীল পেশ করেননি। অন্যদিকে আমরা যদি কালামী ধারার কিতাবগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই তাদের কিতাবেও তারা এ আকীদা উল্লেখ করেছেন কিন্তু সাথে অসংখ্য যুক্তিভিত্তিক দলীল উপস্থাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (মৃত্যু ৬০৬ হিজরী) এর "নিহায়াতুল উকূল ফি দিরায়াতিল উসূল" কিতাবে দেখতে পাই, তিনি উক্ত আকীদা উল্লেখপূর্বক এর সপক্ষে দর্শন শাস্ত্রের অনেক যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, কালামী ধারার উদ্ভাবনের পর থেকে দর্শন শাস্ত্রীয় যৌক্তিক দলীল দেওয়া শুরু হলেও সাধারণ সহজাত যুক্তির ধারা কিন্তু আগে থেকেই ইসলামী আকীদায় প্রচলিত ছিল। যেমন, আমরা যদি ইমাম আবূ হানীফার "আল-ওসিয়্যাত" নামক রিসালার দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পারো সেখানে তিনি অনেক যুক্তি প্রদান করেছেন।

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, দর্শন মিশ্রিত হওয়ার পূর্বে ইসলামী আকীদা খুবই সহজ সরল এবং সাবলীল ছিল। তাতে ছিলনা দার্শনিক চুক্তির কচকচানী, যদিও মহান ইমামগণ জনসাধারণের বোধগম্য সহজাত যুক্তি পেশ করতেন মাঝেমধ্যে।

ইসলামী আকীদার আলোচনায় দর্শনশাস্ত্রের কীভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছে, এটা জানতে গেলে আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে রোম থেকে আরবে দর্শন কীভাবে আমদানী হলো। গ্রীক দর্শন আরবে আমদানী হয় আব্বাসীয় খলীফাদের মাধ্যমে। আব্বাসী দ্বিতীয় খলীফা মানসুর (মৃত্যু: ১৫৮ হিজরী) জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তার শাসনামলে জ্ঞানের সেবার জন্য তিনি "বায়তুল হিকমাহ" প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে আব্বাসী ৭ম খলীফা মামুনের (মৃত্যু: ২১৮ হিজরী) শাসনামলে জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রের অনুবাদের চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। এসময়ে গ্রীক দর্শনের অনুবাদের সূচনা হয়। এই অনুবাদের মাধ্যমেই আরবের মুসলমানদের মাঝে গ্রিক দর্শনের চর্চা শুরু হয়।

অনেকের ধারণা, আব্বাসী আমলে দর্শনের অনুবাদ হয় এবং এই দর্শনকে লুফে নেওয়ার কারণে মুতাযিলাগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। একথাটি ঐতিহাসিকভাবে সঠিক নয়। কারণ:

প্রথমত, দর্শনের কারণেই যদি মুতাযিলাদের আবির্ভাব হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই দর্শন আরবে আমদানী হওয়ার পরে মুতাযিলাদের আবির্ভাব হবে। অথচ যদি আমরা ধরেও নিই যে, আব্বাসীও ২য় খলীফা মানসুরের সময় গ্রীক দর্শন অনুবাদ হয়েছে তাহলেও দেখা যাচ্ছে খলীফা মানসূর শাসনভার পরিচালনা

করেছেন ১৩৫ হিজরী থেকে ১৫৮ হিজরী পর্যন্ত। অথচ মুতাযিলা মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইবন আতা ইন্তিকাল করেন ১৩১ হিজরীতে। অর্থাৎ গ্রিক দর্শন আমদানীর আগেই মুতাযিলা মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ইন্তিকাল করেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, মূলত দর্শনের প্রভাবে মুতাযিলা গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছে বিষয়টি এমন নয়। বরং দর্শন আরবে আমদানী হওয়ার অনেক পূর্বেই মুতাযিলাসহ অনেক ফিরকা আবির্ভূত হয়।

মুতাযিলা ফিরকা উদ্ভাবণের কার্যকরণ

আমরা যদি মুতাযিলা ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা এবং তার পরের কয়েক প্রজন্ম দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে, তারা সকলে ইরাকের বাগদাদ নগরীর আশে পাশে বসবাস করতেন। ইরাক প্রাচীনকাল থেকেই জ্ঞান বিজ্ঞানে সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত। পাশের দেশ ইরান এক সময়কার পরাশক্তি ছিল। সেখানেও দার্শনিকদের মিলনমেলা ছিলো। পাশের দেশের জ্ঞান বিজ্ঞান এবং দর্শনের ছিটাফোঁটা বাগদাদেও পৌঁছেছিল। যার ফলে আরবে প্রচলিত নয় এমন উদ্ভট কথাবার্তা বাগদাদের কেউ কেউ (তন্মধ্যে ওয়াসিল ইবন আতা অন্যতম) বলা শুরু করে। মুতাযিলাদের প্রথম যে মারাত্মক ভুল ছিল সেটা হল, কুরআন সুন্নাহর ওপর যুক্তি বা আকলকে প্রাধান্য দেওয়া। এই দর্শন ইতিপূর্বে আরবের কোনো গোষ্ঠীর মাঝে দেখা যায়নি। পারস্য যেহেতু দর্শনের একটা কেন্দ্রবিন্দু ছিল এবং দর্শনের মূল কথা যেহেতু যুক্তির আলোকে কথা বলা। একারণে একথা বলা যেতেই পারে যে, পারসিক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুতাযিলাদের কুরআন হাদীসের ওপর যুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া শুরু করে। আর এভাবেই "নসের ওপর যুক্তির প্রাধান্য প্রদান" এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে মুতাযিলা নামক এক যুক্তিবাদী ফেরকার উদ্ভাবন হয়। পরবর্তী তারা এই মূলনীতির সাথে আরো অনেক মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করে একটি পূর্ণাঙ্গ ফিরকায় রুপ লাভ করে।

মুতাযিলা ফিরকার সাথে গ্রিক দর্শনের সাক্ষাতগ্রহণ এবং সেটাকে লুফে নেওয়া

একদিকে পারসিক দর্শনের মাধ্যমে মুতাযিলা প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করতে থাকে অন্যদিকে সময়ের বিবর্তনে গ্রীক দর্শন অনুবাদের মাধ্যমে আরবে প্রসার লাভ করে। এভাবে আরবে গ্রীক দর্শন চর্চা শুরু হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নতুনত্বের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার কারণে মুসলমানদের ভিতরকার কতিপয় তরুণ ফ্যাশন হিসেবে দর্শন চর্চায় মনোনিবেশ করেন। এর ফলে তারা দর্শনের আদলে সবকিছু বুঝতে গিয়ে কুরআন সুন্নাহর শিক্ষাকে দূরে সরিয়ে দিতে লাগলো। এভাবে ইসলামী খিলাফাতের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে দর্শনচর্চার নামে ধর্মহীনতা শুরু হয়।

ইসলামী সালতানাতের কেন্দ্রবিন্দুতে দর্শনের এমন জয়জয়কার অবস্থা দেখে মুতাযিলারাও তাদের চিন্তা চেতনা ও আকীদা বিশ্বাসকে যৌক্তিকভাবে প্রমাণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন। তাছাড়া আগে থেকেই তো তারা যুক্তিবাদী চিন্তা চেতনা লালন করতো। ফলে সহজেই তারা এ দর্শনকে লুফে নিতে পারে। কারণ, দার্শনিকদের দর্শনের ভিত্তি আর তাদের মতবাদের মূল ভিত্তি একই। ফলে যুক্তিতে একাকার হয়ে মুতাযিলারা দার্শনিকদের পরিভাষাসমূহ গ্রহণ করে তাদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালায় এবং ইসলামী খিলাফতের খলীফাকে তাদের দলভূক্ত করতে সমর্থ হয়। এভাবে মুতাযিলা মতবাদ রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যাপক প্রচার প্রসার লাভ করে। আর তারা তাদের মতবাদকে প্রমাণিত করার জন্য অনূদিত গ্রীক দর্শনের ব্যবহার শুরু করে।

কালামবিদ নামে যারা সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধ লাভ করেন

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, মুতাযিলারা দর্শনকে আশ্রয় করে তাদের আকীদা বিশ্বাসের ওপর যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করতে শুরু করেন। তারা যেহেতু নিজেদের দর্শনাশ্রিত বক্তব্যকে অন্যদের চেয়ে ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ মনে করতো, তাই নিজেদেরকে "মুতাকাল্লিম" বা বক্তা নামে পরিচয় দিতো। ফলে ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম মুতাযিলারা মুতাকাল্লিম বা কালামবিদ নামে পরিচয় লাভ করে। এ পর্যায়ে আহলুস সুন্নাহর অনেক ইমাম কালাম শাস্ত্রের বিরোধিতা করেন।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের উলামায়ে কিরামের কালামীধারা গ্রহণ

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, গ্রীকদর্শন আরবে আমদানী হওয়ার আগ থেকেই মুতাযিলারা দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কুরআন সুন্নাহর ওপর যুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া শুরু করে। এরপর যখন গ্রীক দর্শন আরবে অনূদিত হয় তখন মুতাযিলীরা তাদের দর্শনের পরিভাষার মাধ্যমে তাদের বিগত বা নতুন মতবাদের স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়। এভাবেই মুতাযিলীদের মাধ্যমে ইসলামী আকীদায় দর্শন ঢুকে পড়ে। তাদের প্রথমদিককার কিতাবগুলো দেখলে তাহলে আমাদের এ দাবীর সতত্য দেখতে পাব।

অর্থাৎ ইসলামী আকীদায় দর্শন অনুপ্রবেশের মধ্য দিয়ে ইলমে কালাম নামক এক শাস্ত্রের জন্ম হয়। আর শাস্ত্রের উদ্ভাবক মুতাযিলাগণ। তারা দর্শনকে ইসলামী আকীদার সাথে সংযুক্ত করে এটাকে ইলমে কালাম নামে অভিহিত করে। মুতাযিলী কালামীদের মাধ্যমে মূলত ইসলামী দর্শন তথা কালাম শাস্ত্রের উত্থান হয় এবং সেটা ধীরে ধীরে চরম উৎকর্ষতা লাভ করে।

এই কাজটি যখন হয়েছে অর্থাৎ মুতাযিলীদের মাধ্যমে দর্শন ইসলামী আকীদাশাস্ত্রে স্থান করে নিয়েছে এবং কালামী দর্শনের মোটামুটি উন্নতি লাভ করেছে তখন পর্যন্ত সুন্নী উলামায়ে কিরাম এদিকে বিশেষ কোনো মনোযোগ দেননি।

দর্শনশাস্ত্র যে উম্মতে মুসলিমার অন্তরালে এতো গভীরভাগে অনুপ্রবেশ করেছে,তা সর্বপ্রথম উম্মতের সামনে আসে "কুরআন সৃষ্ট" মাসআলাকে কেন্দ্র করে। "কুরআন সৃষ্ট" মাসআলাকে কেন্দ্র করে যে অস্থিরতা তৈরী হয় সেই অস্থিরতার পরই সুন্নী উলামায়ে কিরাম উপলব্ধি করেন যে, দর্শন মিশ্রিত মুতাযিলী আকীদা বা মুতাযিলী কালাম কীভাবে উম্মতের এক শ্রেণির মাঝে বিস্তার লাভ করেছে। এরপর থেকেই মূলত শুরু হয় সুন্নী উলামায়ে কিরাম এবং মুতাযিলী কালামীদের মধ্যকার কাশমাকাশ।

মুতাযিলী কালামীদের সাথে এ দার্শনিক যুক্তি ও তর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মতো অবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে সুন্নী উলামায়ে কিরামের ছিলনা। কেননা- প্রথমত, সুন্নী সকল উলামায়ে কিরাম বিশ্বাস করতেন যে, ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের জন্য কুরআন হাদীসই যথেষ্ট। কারণ অন্য কোনো দর্শন বা যুক্তির সাহায্যে এসব আকীদা প্রমাণ করার প্রয়োজন এর আগে কখনো হয়নি। তাছাড়া, দর্শন শাস্ত্র যেহেতু একটা অনৈসলামী বিজাতীয় চিন্তাধারা থেকে এসেছে, এজন্য সুন্নী ইমামগণ যথাসম্ভব এ শাস্ত্রটিকে এড়িয়ে চলাই উচিত বলে মনে করতেন।

তাছাড়া অনেক হাদীসের ভাষ্যমতে, নবীজি ﷺ অতিরিক্ত প্রশ্ন ও যুক্তি তর্ক পছন্দ করতেননা। একারণে সালাফের উলামায়ে কিরাম এধরনের যুক্তি তর্কে জড়াতে চাননি। এছাড়াও আরো অনেক কারণ রয়েছে। এসকল কারণে

সালাফের উলামায়ে কিরাম শুরুর দিকে মুতাযিলা কর্তৃক সৃষ্ট বিবাদে জড়িয়ে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে নিজেদেরকে হক প্রমাণিত করার চেষ্টা করেননি।

একারণে মুতাযিলীদের সাথে আলোচনা যুদ্ধে বাধ্য হয়ে অবতীর্ণ হওয়া সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধাদের একজন ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল আলোচনার মঞ্চে কেবলমাত্র কুরআন হাদীসের আলোকে নিজের আকীদা সুদৃঢ়রূপে উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি এর বাইরে মুতাযিলাদের মত দার্শনিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে কুরআন সুন্নাহে বর্ণিত আকীদাকে প্রমাণিত করার চেষ্টা করেননি। তারা যেহেতু দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেননি, ফলে তাদের যা করার ছিল সেটাই করেছেন। তারা নিজেদের অবস্থানের উপর সুদৃঢ় থেকে মুতাযিলী দার্শনিকদের বয়কটের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এই দুটি কাজ সময় ও নিজেদের সামর্থের বিচারে যে কী পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে বিষয়ে এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব না। তবে এতটুকুই বলব যে, সে সময় যদি তারা হকের উপর অবিচল না থাকতেন তাহলে আজ আমাদের জন্য বিশুদ্ধ আকীদা পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়তো।

আর যদি তারা সেসময় তাদেরকে বয়কট না করতেন তাহলে উম্মতের যুবক শ্রেণির মাঝে তাদের প্রসারতা আরো বৃদ্ধি পেত এবং পরবর্তীতে উম্মতকে এক ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হতো। তারা এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করে উম্মতকে তাদের থেকে সতর্ক করেন এবং তাদেরকে বয়কটের ঘোষণা দেন।

এ বয়কটের ঘোষণাস্বরূপ উম্মতের সুন্নী উলামায়ে কিরাম থেকে অনেক বক্তব্য আমরা পাই। যেমন হানাফী মাযহাবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইমাম কাযী আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন- العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم. অর্থাৎ "কালামশাস্ত্রের জ্ঞান প্রকৃত অর্থে অজ্ঞতা, আর কালাম শাস্ত্র সম্পর্কে না জানাই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান।" তাঁর এ কথাটি মূলত সে সময়ের, যখন কালাম শাস্ত্র বলতে কেবল মুতাযিলাদের চর্চিত কালাম শাস্ত্রকেই বুঝানো হতো। এধরণের অসংখ্য উলামায়ে কেরামের বক্তব্য আমরা পাই। যেসকল বক্তব্যের মাধ্যমে তারা কালামকে বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন।

তবে আমাদের অনেকেই এক্ষেত্রে একটি মারাত্মক ভুল করি।আর তাহলো, মুতাযিলী কালামীদের বয়কটের ডাক দিয়ে উলামায়ে সালাফ যে সকল বক্তব্য দিয়েছেন, সেগুলোকে আমরা সুন্নী কালামীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। অথচ এটা সম্পূর্ণ বাস্তবতাবিবর্জিত। বাস্তবতা বিবর্জিত হওয়ার মূল কারণ হল, যে সকল উলামায়ে কিরাম থেকে মুতাযিলী কালামীদের বয়কটের আহ্বান আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখেছি, সেটা সুন্নী কালামীদের আবির্ভাবের বেশ পূর্বে। সুতরাং আবির্ভাব হওয়ার পূর্বেই কী করে উলামায়ে কিরাম তাদের সম্পর্কে নিন্দা জ্ঞাপন করবেন?

মুতাযিলী কালামের বিপরীতে সুন্নী কালামী ধারার সূচনা যাদের মাধ্যমে হয়েছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রণিধাণযোগ্য হলেন ইমাম আবুল হাসান আশআরী এবং ইমাম আবুল মানসুর মাতুরিদী। তাদের প্রথমজন ইন্তিকাল করেছেন ৩৩০ হিজরী সনে। আর অন্যজন ইন্তিকাল করেছেন ৩৩৩ হিজরী সনে। যদিও তাদের পূর্বে আরো কিছু আলিম এই ধারায় আকীদার চর্চা শুরু করেছিলেন, কিন্তু তাদের মাধ্যমেই আহলুস সুন্নাতের ভিতরের কালামী ধারাটি প্রতিষ্ঠা ও প্রসিদ্ধি লভ করেছে। ফলে তাদের মাধ্যমে সুন্নী কালামীধারা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে সালাফে সালিহীন থেকে কালামের বিরুদ্ধে যেসকল মন্তব্য পাওয়া যায়, তা কোনভাবেই তাদের প্রতিষ্ঠিত ধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না।

আমরা আলোচনা করছিলাম মুতাযিলা কর্তৃক উলামায়ে সুন্নীদের ফিতনায় ফেলার পূর্ব পর্যন্ত উম্মতের বিদগ্ধমহল তাদের প্রতি বিশেষে মনোযোগ দেননি। অবশ্যক ক্ষেত্র বিশেষ অনেক উলামায়ে কিরাম তাদের সম্পর্কে সর্তক করেছেন কিন্তু সেটা ব্যাপকভাবে উম্মতের সামনে এসেছে কুরআন সৃষ্ট মাসয়াকে কেন্দ্র করে মুতাযিলাদের ফিতনার পর। এ ফিতনায় জড়িত হওয়ার পর উলামায়ে কিরামের অবস্থান আমরা জেনেছি যে, তারা যুক্তি তর্কে না গিয়ে কুরআন হাদীসের বক্তব্যই তুলে ধরেছিলেন। আমরা এও জেনেছি যে, এ যুদ্ধের একজন্য অগ্রনায়ক ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল সালাফের পথ থেকে সরে নতুন এ বিষয়ে কথা বলাকে বৈধই মনে করেননি।

যদিও ইসলামের আল্লাহপ্রদত্ত শক্তি ও উলামায়ে কিরাম বিশেষত: ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের দৃঢ়তার কারণে এ ফিতনা আপাত: দূরীভুত হয়, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরে মুতাযিলী কালামকে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে অযৌক্তিক প্রমাণ সময়ের দাবী হয়ে পড়ে। কারণ একটা দর্শনকে মানিনা বলে অগ্রাহ্য করার মাধ্যমে নিজের দূর্বলতাই প্রকাশ পায়। কোনো দর্শনকে ভূয়া প্রমাণের জন্য দার্শনিক যুক্তি উপস্থাপন হয়। এ বাস্তবতা উপলব্ধি করেই মূলত সুন্নী উলামায়ে কিরামের কতিপয় আলিম এ ময়দানে অবতীর্ণ হন।

এসকল উলামায়ে কেরামের অন্যতম দুই অগ্রনায়ক ইমাম আবু মনসূর মাতুরিদী ও ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রা.) এর কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তাদের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারীদের মধ্যে যে কালামী ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়, সে ধারাটি তাদের দু'জনের প্রতি সম্বন্ধিত হয়ে যথাক্রমে মাতুরিদী মাযহাব ও আশআরী মাযহাব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইমাম মাতুরিদী যেহেতু আকীদা ও ফিকহ উভয়ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তাই পরবর্তীতে হানাফীগণ আকীদার ক্ষেত্রে মাতুরিদী ধারার অনুসারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। অন্যান্য মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে আশআরী ধারা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে যে সকল উলামায়ে কিরাম মুতাযিলাদের বিপরীতে কালাম শাস্ত্র চর্চা শুরু করেন, তারা কোন যুক্তি বা দলীলের ভিত্তিতে কালামশাস্ত্রের এমন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন, যে ব্যাপারে স্বয়ং তাদের মান্যবর ও অনুসরণীয় সালাফ উম্মতকে সতর্ক করেছেন এবং যে শাস্ত্রকে সালাফগণ বয়কট করেছেন?

আসলে ইমাম আবুল মনসূর মাতুরিদী (র.)সহ আহলুস সুন্নাহর মুতাকাল্লিম উলামায়ে কিরাম যেহেতু সালাফে সালিহীনের ইলমের প্রকৃত উত্তরাধিকার ছিলেন, তাই তারা সালাফে সালিহীনের কালামবিরোধিতার ক্ষেত্রটি আমাদের চেয়ে ভালো বুঝতেন। তারা জানতেন যে সালাফে সালিহীন কালাম শাস্ত্রের বিরোধিতা করতেন যেহেতু সেসময় ঐ শাস্ত্রে কুরআন-সুন্নাহর উপর মানবীয় বুদ্ধির প্রাধান্য দেওয়া হতো, এবং কুরআন সুন্নাহকে মানবীয় যুক্তির আওতায় নিয়ে আসা হতো। পক্ষান্তরে সুন্নী মুতাকাল্লিমগণ সালাফে সালিহীনের অনুসরণে কুরআন-সুন্নাহকেই প্রাধান্য দিয়েছেন সবসময়, তারা শুধুমাত্র কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে সালিহীনের নিকট থেকে যে বিশুদ্ধ আকীদা অর্জন করেছিলেন, সেটাকে অক্ষুণ্ন রেখে সেটার পক্ষে মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক যুক্তি হাযির করেছেন। যেহেতু তারা মৌলিক আকীদাকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন, তাই তাদের চর্চিত কালামশাস্ত্র মূলত সালাফে সালিহীনের চর্চিত আকীদারই

বিস্তারিত ও বিন্যস্ত সংস্করণ, মৌলিকভাবে এটি তাদের পক্ষ থেকে সংযোজিত কোন নতুন চিন্তাধারা নয়।

অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন, মুতাযিলারা যে ভুল করেছে, সেই একই ভুল কেন সুন্নী কালামীরা করলেন? অর্থাৎ মুতাযিলার মতোই বিভিন্ন দার্শনিক পরিভাষা কেন আশআরী-মাতুরিদীগণ তাদের কিতাবে সংযোজিত করলেন। আসলে মুতাযিলী কালামীরা যে ভুল করেছেন, সুন্নী কালামীরা সে ভুল করেনি। তাদের কিতাবাদি পড়লে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয় যে, তারা কুরআন সুন্নাহর বিপরীত কোনো বক্তব্যকে দর্শনের হাতিয়ার বানিয়ে ইসলামের ভিতর অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেননি, যেমনটা মুতাযিলী কালামীরা করেছেন। তারা কেবল যুগের প্রয়োজনে নিজেদের ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদার সপক্ষে দর্শনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন, যে দর্শন শাস্ত্রকে এর আগে ভ্রান্তগোষ্ঠীগুলোই কেবল তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতো। এর ফলে দর্শনের উপর ভ্রান্ত ফিরকাসমূহের একচেটিয়া আধিপত্য যেমন কমেছে, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরেও ভ্রান্ত ফিরকাগুলোর গ্রহণযোগ্যত কমে এসেছে।

এখনো কী দার্শনিক পরিভাষায় রচিত সুন্নী আকীদা পড়ার প্রয়োজন আছে?

এ প্রশ্নের উত্তর হল, সাধারণ মানুষের জন্য এ দর্শন মিশ্রিত আকীদার বই পড়ার কোনো দরকার নেই। বরং তাদের জন্য এটা অনুত্তম। কারণ এ শাস্ত্রটি এতোই জটিল যে সাধারণ মানুষের পক্ষে এটি অধ্যয়ন করে সঠিকভাবে আয়ত্ত করার চেয়ে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়। এ জন্য সাধারণের জন্য সালাফে সালিহীনের সহজ-সরল আকীদাই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে উম্মতের সকল আলিমগণের নিকট সালাফের আকীদার প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে স্বীকৃতি আকীদাতুত তাহাবী অধ্যয়নই যথেষ্ট।

কিন্তু উলামা শ্রেণি যারা নিজেদেরকে যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত করতে চান তাদের জন্য ক্রমন্বয়ে আধুনিক দর্শন এবং ধীরে ধীরে সুন্নী কালামী দর্শন পড়াকে উত্তম মনে হয়। যারা যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে চান, তাদের জন্য প্রথম করণীয় হয়, সেযুগের চ্যালেঞ্জ বুঝে তদানুযায়ী নিজেদেরকে প্রস্তুত করা। সুন্নী কালামীদের প্রথম যুগে যে চ্যালেঞ্জ ছিল আজ সেটা নয় বরং তার জায়গায় ভিন্ন চ্যালেঞ্জ যুক্ত হয়েছে। একারণে এমন ব্যক্তির জন্য প্রথম করণীয় হল, যুগের চাহিদা বুঝে শিক্ষাগ্রহণ করা এরপর সময় এবং সামর্থ থাকলে তার পূর্ববর্তী অনুসারীরা তাদের যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবেলা কীভাবে করেছেন, সেটাও জানা। এতে তার জ্ঞানটা আরো সুবিন্যাস্ত ও মজবুত হবে। এভাবে সে নিজেকে প্রস্তুত করবে।

কিন্তু ইলমুল কালামের উপর বিশেষজ্ঞ একদল উলামায়ে কিরামের প্রয়োজনীয়তা কখনোই ফুরিয়ে যায়নি। তাই এখনো বিভিন্ন ভ্রান্ত আকীদার বিরুদ্ধে সঠিক আকীদার পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য একদল বিশেষজ্ঞ আলিমের অবশ্যই মাতুরিদী-আশআরী মাযহাবের আকীদা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা আবশ্যক, যাতে তাঁরা যুগের চাহিদা অনুসারে নিজেদেরকে প্রস্তুত করে যে কোন ভ্রান্ত আকীদার আক্রমণ থেকে ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাকে সুরক্ষিত করে রাখতে পারেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নারায়ে তাকবীর
নারায়ে রিসালত

আল্লাহু আকবার
ইয়া-রাসুলাল্লাহ (সাঃ)

কুত্‌বুল
আউলিয়া হাদিয়ে যামান
শাহ্ ছূফী আলহাজ্জ হযরত মাওলানা আবূ ইউছুফ মোঃ ইয়াকুব
ছাহেব বদরপুরী [রহঃ] এর ৬৩তম ঈসালে সাওয়াব উপলক্ষে-

আজিমুশ্বান জলছা

স্থান ঃ কুলাউড়া আলালপুর
আত্তরখান হাফিজিয়া মাদ্‌রাসা ও এতিমখানা প্রাঙ্গণ।
তারিখঃ ১৬ই মাঘ, রবিবার
(৩০শে জানুয়ারি ২০২২ ইংরেজি)

সভাপতি ঃ মুরশিদে বরহক
হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী
বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী

দেশ ও বিদেশের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম ওয়াজ ফরমাইবেন।
আপনারা দলে দলে যোগদান করতঃ অশেষ ছওয়াব হাছিল করুন।

কোন পথে আজ লিবিয়া ও ইরাক?

রহমান মুখলেস

লিবিয়া ও ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দেশ দুটিতে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফীকে নির্মমভাবে হত্যা ও ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে প্রথমে আটক ও পরে ইরাকী আদালতে প্রহসনের বিচারে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়েছিল। আজ থেকে এক দশক আগে লিবিয়ার উন্নয়নের প্রতীক গাদ্দাফীকে ন্যাটো বাহিনীর সদস্যরা নির্মমভাবে হত্যা করে। আর আজ থেকে প্রায় ১৯ বছর আগে তৎকালীন মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট যুদ্ধে আটক করে পরে বিচারের নামে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। দুই নেতার একই পরিণতি। কিন্তু আজ ১৯ বছর পর সেই ইরাকে শান্তি ফিরেছে কি? শান্তি ফিরেছে কি লিবিয়ায়? দেশ দুটি আজ কোন পথে? ইরাকে দুই মাসেরও আগে নির্বাচন হলেও ক্ষমতা হস্তান্তর হয়নি। বরং প্রতিদিন বোমায় ক্ষত–বিক্ষত হচ্ছে দেশটি। এমনকি দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মুস্তাফা আল কাদিমীকে হত্যার জন্য সম্প্রতি তাঁর বাসভবন লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালানো হয়। বিস্ফোরকভর্তি ড্রোন দিয়ে এ হামলা চালানো হয়। তবে প্রাণে বেঁচে যান মুস্তাফা আল কাদিমী। অন্যদিকে আগামী ২৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘের উদ্যোগে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং আগামী জানুয়ারিতে পার্লামেন্ট নির্বাচন। এখন সবার সামনে একই প্রশ্ন এতে লিবিয়ায় শান্তি ফিরবে কি? আর ইরাকের পরিস্থিতিই বা কোন দিকে গড়াবে?

লিবিয়ায় শান্তি ফিরবে কি?

উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশ লিবিয়ায় পশ্চিমা ধাঁচের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়িমের লক্ষ্যে আজ থেকে ১০ বছর আগে দেশটির সবুজ বিপ্লবের নেতা কর্নেল মুয়াম্মার গাদ্দাফীকে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর সমর্থনপুষ্ট বিরোধী একটি গোষ্ঠী নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। কিন্তু গাদ্দাফী হত্যার ১০ বছর পরেও দেশটিতে না কায়িম হয়েছে গণতান্ত্রিক সরকার, না ফিরেছে শান্তি। বরং গাদ্দাফী হত্যার পর গঠিত পরবর্তী সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রে যাওয়ার লড়াইয়ে নেমেছে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী। কেন্দ্রীয় সরকারকে রীতিমত চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে হাফতার বাহিনীসহ বহুধাবিভক্ত মিলিশিয়ারা। যা দেশটিকে বিভক্ত করেছে। সহিংসতা–সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে দেশটি। অবশেষে চলতি বছরের প্রথম দিকে মার্কিন সমর্থন আর চাপে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় গঠিত হয়েছে দেশটিতে নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। প্রেসিডেন্ট হয়েছেন মুহাম্মদ ইউনুস মানফী, প্রধানমন্ত্রী আবদুল হামিদ মুহাম্মদ দাবিবাহ। আগামী ২৪ ডিসেম্বর এই সরকারকে প্রেসিডেন্ট এবং পার্লামেন্ট নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু এই নির্বাচনের মধ্যদিয়ে দেশটিতে শেষ পর্যন্ত শান্তি ফিরবে কি?

যেখান থেকে লিবিয়া সংকটের শুরু

লিবিয়ায় টানা ৪২ বছর শাসনক্ষমতায় ছিলেন মুয়াম্মার গাদ্দাফী। কিন্তু আরব বসন্ত নামে দমকা হাওয়া উলট-পালট করে দিয়েছে লিবিয়াসহ পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে। তবে এই আরব বসন্তের ঢেউ প্রথম শুরু তিউনিসিয়ায়। শুরুটা হয়েছিল ২০১০ সালের ১৭ ডিসেম্বর। তিউনিসিয়ায় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ওই দিন নিজের গায়ে আগুন জ্বেলে আরব বসন্তের আবহ তৈরি করেছিলেন তিউনিসিয়ার সবজি বিক্রেতা বাওয়াজিজী। আর তাঁর সেই আত্মাহুতি শেষ পর্যন্ত তিউনিসিয়ায় সূচনা করে ব্যাপক গণবিক্ষোভ। পশ্চিমা মদদে শেষ পর্যন্ত পতন ঘটে তিউনিসিয়ার তৎকালীন সরকারের। আর তিউনিসিয়ার এই জাগরণকে পশ্চিমারা নামকরণ করে আরব বসন্ত নামে। পরে সেই আরব বসন্তের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে মিসর, লিবিয়া, ইয়েমেন, বাহরাইন ও সিরিয়ায়। কিন্তু কোথাও আজ পর্যন্ত শান্তি ফিরেনি। লিবিয়ায় এই আরব বসন্তের জাগরণ ২০১১ সালে। দেশটিতে তখন ক্ষমতায় কর্ণেল মুয়াম্মার গাদ্দাফী। দেশটির গাদ্দাফী বিরোধী শক্তি ও গোষ্ঠীগুলোকে উসকে দেয় পশ্চিমা দেশগুলো। ১৯৬৯ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তৎকালীন লিবিয়ার রাজা ইদ্রিসকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতায় বসেছিলেন তিনি। লিবিয়ার দীর্ঘ দিনের শাসক গাদ্দাফীকে উৎখাত করে দেশটিতে তথাকথিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ঠ হয় যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো জোট।

অস্ত্রসহ সার্বিকভাবে সহায়তা করে গাদ্দাফী বিরোধীদের। এতে লিবিয়ায় ব্যাপক আন্দোলন ও সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভ চলাকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোও পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ পরিবেশন করে গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে। সংঘাতের এক পর্যায়ে গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে লিবিয়ায় বোমাবর্ষণ শুরু করে ন্যাটো জোট। আকাশ থেকে ন্যাটো বোমা ফেলছিল, আর নিচে তখন ব্রাদারহুডের একটি অংশ গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। শেষে ন্যাটো সমর্থিত বাহিনীর হাতে লিবিয়ার দীর্ঘসময়ের নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফীর পতন।

নিজের শহর সিরতে নিহত হন উন্নত লিবিয়া গড়ার কারিগর গাদ্দাফী। ন্যাটোর একটি গোষ্ঠীর হাতেই তিনি নিহত হন। একসময়ের ব্যাপক জনপ্রিয় গাদ্দাফীর মরদেহ একটি বিপণিবিতানের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছিল তারা। আরব বিশ্ব ও আফ্রিকায় জনপ্রিয় হলেও পশ্চিমাদের চোখে ‘একনায়ক’ ছিলেন গাদ্দাফী। লিবিয়ায় হামলা ও ন্যাটোর বোমাবর্ষণে সবচেয়ে উৎসাহী ছিলেন তৎকালীন ফরাসি

প্রেসিডেন্ট সারকোজি। সারকোজির বিরুদ্ধে তখন এমন অভিযোগ ছিল যে, নিজের নির্বাচনী প্রচারণার জন্য গাদ্দাফীর কাছ থেকে তিনি প্রচুর অর্থ নিয়েছিলেন। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আ প্রমিজড ল্যান্ড'এ সারকোজি এবং তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের লিবিয়া সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলোর তীব্র সমালোচনা করেছেন। এদিকে গাদ্দাফী হত্যার পর থেকেই লিবিয়ায় শুরু নতুন সহিংসতার।

শুরু হয় গৃহযুদ্ধের। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভক্তি জোরালো হয়ে ওঠে। গাদ্দাফী আমলের সমৃদ্ধ অর্থনীতির লিবিয়া এখন অস্তিত্বের সংকটে ধুকছে। গাদ্দাফী নিহত হওয়ার পর এক পর্যায়ে লিবিয়ায় দুটি পরস্পর বিরোধী গ্রুপ পৃথকভাবে দেশটি শাসন করতে থাকে। একটির নেতৃত্বে ত্রিপলীভিত্তিক লিবীয় সরকার। অন্যটির নেতৃত্বে ছিল খলীফা হাফতারের বিদ্রোহী বাহিনী। এক পর্যায়ে হাফতারের বাহিনীর দখলে চলে যায় দেশটির বিস্তৃত অঞ্চল।

নতুন সংঘাত ও বিভক্তি

একপর্যায়ে অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাহীনতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে লিবিয়া। জেনারেল হাফতার নিজেই দেশটির ক্ষমতা নিতে তৎপরতা শুরু করেন। তবরুক ও বেনগাজী শহরকে ভিত্তি করে গঠন করেন লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা এলএনএ। খলীফা হাফতার ছিলেন একসময় গাদ্দাফীর দীর্ঘ সময়ের বন্ধু। গাদ্দাফীকে ক্ষমতায় আরোহণে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছিলেন। পরবর্তীতে সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় আমেরিকায় পাড়ি জমান এবং ২০১১ সালে আরব বসন্তের সময় লিবিয়ায় ফিরে এসে গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখেন। এরপর ২০১৪ সালে 'অপারেশন ডিগনিটি' পরিচালনার মাধ্যমে খলীফা হাফতার পরিচিত হয়ে ওঠেন। আর এ সময় থেকেই মূলত: লিবিয়ায় দুটো সরকার পরিচালিত হয়ে আসছে; একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত ও জাতিসংঘ সমর্থিত রাজধানী ত্রিপলি কেন্দ্রীক 'গভর্ণমেন্ট অব ন্যাশনাল অ্যাকোর্ড' (জিএনএ) এবং অপরটি খলীফা হাফতার নিয়ন্ত্রিত তব্রুক কেন্দ্রীক 'হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ' (এইচওআর)। ২০১৫ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে বিবদমান পক্ষগুলোকে নিয়ে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়, যা গভর্ণমেন্ট অব ন্যাশনাল একর্ড (জিএনএ) নামে পরিচিত। পরবর্তীতে ফায়েজ আল সারাজের নেতৃত্বাধীন জিএনএর সাথে বিরোধে লিপ্ত হয় বিদ্রোহী গ্রুপ খলীফা হাফতারের নেতৃত্বাধীন লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (এলএনএ)। হাফতার বাহিনী লিবিয়ার বেশ কিছু শহর ও অঞ্চল দখলে নেয়। এরপর তুরস্কের সেনারা প্রবেশ করে লিবিয়ায়। জাতিসংঘ সমর্থিত সারাজের নিয়ন্ত্রাধীন জিএনএ-র সহযোগিতায় এগিয়ে আসে তুরস্কের এই সেনারা। তারা বিপুল পরিমাণে গোলাবারুদ, অত্যাধুনিক ড্রোন আর সিরিয়া থেকে বিদ্রোহীদের এনে হাফতার বাহিনীর ত্রিপোলি অভিযান রুখে দেয়। এরপর আবারও জাতিসংঘের উদ্যোগে গত মার্চে সব পক্ষগুলোকে নিয়ে লিবিয়ায় গঠিত হয় ঐকমত্যের সরকার। সব ঠিক থাকলে আগামী ২৪ ডিসেম্বর লিবিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। আর ২০২২ সালের জানুয়ারিতে হবে পার্লামেন্ট নির্বাচন।

কে এই খালীফা হাফতার?

খলীফা হাফতার গত চার দশক ধরেই লিবিয়ার রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। এই সময়ে তাঁর অনেক উত্থান-পতন হয়েছে। কখনো তিনি ছিলেন লিবিয়ার ক্ষমতা কেন্দ্রের কাছাকাছি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, কখনো তাঁকে ক্ষমতা থেকে দূরে সরে যেতে হয়েছে। পরে আবার ক্ষমতার কেন্দ্রে। এক পর্যায়ে গাদ্দাফীর সঙ্গে বিরোধ এবং আমেরিকায় স্বেচ্ছা নির্বাসন। যুক্তরাষ্ট্রে থাকতেই গাদ্দাফী-বিরোধী তৎপরতা শুরু হাফতারের। পরে গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে আন্দোলন ও লড়াই শুরু হলে দেশে প্রত্যাবর্তন এবং গাদ্দাফীকে উৎখাতে লড়াইয়ে সামিল হন। তাঁর সঙ্গে সিআইএ'র বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

গাদ্দাফীর ছেলের প্রার্থিতা বাতিল

জাতিসংঘের উদ্যোগে আগামী ২৪ ডিসেম্বর লিবিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও ২০২২ সালের জানুয়ারিতে পার্লামেন্ট নির্বাচন। নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন লিবিয়ার প্রয়াত শাসক মুয়াম্মার গাদ্দাফির 'প্রিয়' ছেলে সাইফ আল-ইসলাম আল-গাদ্দাফী (৪৯)। ২০১১ সালে বিদ্রোহীদের হাতে আটকের পরও একমাত্র সাইফ আল-ইসলামই বেঁচে যান। তখন থেকে ছিলেন কারাগারে। তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের হত্যার অভিযোগ আনা হয়। একপর্যায়ে তিনি জেল থেকে মুক্তি পান। গত জুলাইয়ে নিউইয়র্ক টাইমসকে হঠাৎ সাক্ষাৎকার দিয়ে আলোচনায় আসেন তিনি। এরই মধ্যে বিভিন্ন সময়ে খবর আসে, বাবার 'হাতে গড়া' লিবিয়ার হাল ধরতে প্রস্তুত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সাইফ। কিন্তু গত ২৪ নভেম্বর সাইফের প্রার্থিতা বাতিল করে দেয় নির্বাচন কমিশন। এখন লিবিয়ার গাদ্দাফীবিরোধীরা প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত। দেশটির পূর্বাঞ্চলের বেশির ভাগ এলাকা খলিফা হাফতারের নেতৃত্বাধীন লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মির (এলএনএ) নিয়ন্ত্রণে। তাঁর পক্ষে রয়েছে রাশিয়া, মিসর, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশ। অন্যদিকে দেশটির জাতিসংঘ সমর্থিত সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলিসহ পশ্চিমাঞ্চল। তুরস্কসহ বিভিন্ন পশ্চিমা দেশ এই সরকারকে সমর্থন দিয়ে আসছে। ২০১৯ সালে ত্রিপোলি দখলে নিতে হাফতারের বাহিনী জাতিসংঘ-সমর্থিত সরকারের বিরুদ্ধে হামলা শুরু করে।

এদিকে সাইফকে টেক্কা দিতে হাফতারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। তাঁকে শক্তিশালী প্রার্থী হিসেবে মনে করা হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর তালিকায় রয়েছেন লিবিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আবদুলহামিদ আল দিবাহ, পার্লামেন্টের স্পিকার আজুলা সালেহও। জাতিসংঘ, বিশেষ করে পশ্চিমাদের কাছে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তবে নির্বাচনে কে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসতে পারবেন, সেটার নিশ্চয়তা নেই।

ইরাক পরিস্থিতি কোন দিকে?

আসলে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ও ইসরায়েলের চেয়ে শক্তিশালী কোন মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মানতে চায়নি যুক্তরাষ্ট্র। ইসরায়েলকে নিরাপদ রাখতে তৎকালীন ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করায় যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে সর্বাত্মক সামরিক অভিযান চালাতে শুরু করে প্রস্তুতি। তখন ২০০৩ সাল। যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের প্রশাসন ইরাকের শাসক সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সামরিক অভিযান চালাতে মরিয়া হয়ে ওঠে। আর এ হামলাকে জায়িয করতে বুশ প্রশাসন শুরু করে কূটনৈতিক তৎপরতা। এ ক্ষেত্রে তাঁর কুশলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল নেমে পড়েন মাঠে। পাওয়েল সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে মিথ্যা গল্প ছড়াতে থাকেন। যুদ্ধের জন্য একত্রিত করেন তাঁর মিত্র দেশগুলোকে। এমনকি জাতিসংঘের কাছ থেকেও যুদ্ধের অনুমতি আদায় করে নেন।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে নিরাপত্তা পরিষদে বৈঠকের আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্র। ইরাকে সামরিক অভিযান চালানোর সম্মতি পেতে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাওয়েল বৈঠকে বিভিন্ন ধরনের ডায়াগ্রাম ও ছবি তুলে ধরেন। এর মাধ্যমে তিনি নিরাপত্তা পরিষদের অন্য সদস্যদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে ইরাক সরকারের হাতে বিপুল পরিমাণ গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মজুত রয়েছে। এটা শুধু ইরাকীদের জন্যই নয়, পুরো বিশ্বের জন্য মারাত্মক হুমকি। তিনি মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনীর সূত্রের বরাত দিয়ে এসব দাবি করেন। যদিও তাঁর ওই দাবির সমর্থনে কোন প্রমাণ ছিল না। অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদের সব সদস্য এসকল দাবি গ্রহণ ও বিশ্বাস করেনি। প্রথম কয়েক দফায় ব্যর্থ হলেও শেষ পর্যন্ত ইরাকে হামলা চালাতে নিরাপত্তা পরিষদ তথা জাতিসংঘের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয় যুক্তরাষ্ট্র। এরপরের ইতিহাস সবার জানা। ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন ও তার মিত্রজোটের যুদ্ধে ইরাক ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। আর পলাতক অবস্থায় ধরা পড়ে ফাঁসিতে ঝোলেন সাদ্দাম হোসেন।

সেই থেকে আজ প্রায় ১৯ বছর পরও ইরাকে রক্ত ঝড়ছেই। একের পর এক মার্কিন পুতুল সরকার ক্ষমতায় থাকলেও শান্তি ফিরেনি দেশটিতে। অবশ্য পরবর্তীতে ইরাকে মিথ্যা অজুহাতে হামলার জন্য অনুশোচনা করেছেন কলিন পাওয়েল। ২০১১ সালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ইরাকে আগ্রাসন চালানোর বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদে ভুয়া তথ্য দিয়েছিলেন তিনি। গোয়েন্দাদের সরবরাহ করা সব তথ্য সঠিক ছিল না। অনেক তথ্যই ভুল ছিল। এজন্য তিনি এখন অনুতপ্ত। এটাকে তাঁর পেশাজীবনে তাঁর সবচেয়ে 'বড় কলঙ্ক' হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। সাদ্দাম হোসেনের আটক হওয়া এবং ইরাকে কোনো ধরনের গণবিধ্বংসী অস্ত্র না পাওয়ার পরই পাওয়েলের এই সরল স্বীকারোক্তি। কিন্তু ততদিনে ইরাকে বয়ে গেছে রক্তগঙ্গা। প্রাণ গেছে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের। ইরাকের অর্থনীতি, অবকাঠামোর বারোটা বেজে গেছে। যুদ্ধ শুধু ধ্বংস আর রক্তই দিয়ে গেছে ইরাকীদের। উত্থান ঘটেছে নানা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর। সেখানে চলছে আজও হানাহানি। পুরো দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে।

ইরাকী প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার চেষ্টা

সম্প্রতি ইরাকী প্রধানমন্ত্রী মুস্তাফা আল কাদিমীকে হত্যা চেষ্টায় তাঁর বাসভবনে ড্রোন হামলা চালানো হয়। তবে তাঁর কয়েকজন রক্ষী আহত হলেও প্রাণে বেঁচে যান মুস্তাফা আল কাদিমী। গত অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে শিয়া ধর্মীয় নেতা মুকতাদা আল সদরের দল বেশি আসনে জিতেছে। এবারের নির্বাচনে খুব বেশি ভোট পড়েনি। ২০১৮ সালে আল সদরের দলের নেতৃত্বাধীন জোট ৫৪টি আসনে জিতেছিল। আর নির্বাচনের পরই ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে দেশটির রাজধানী বাগদাদজুড়ে শুরু হয় বিক্ষোভ। এরপর প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে হামলা। ইরাকজুড়ে ইরানপন্থী শিয়া মিলিশিয়াদের ব্যাপক প্রভাব। এই মিলিশিয়ারা প্রায়ই হামলা চালিয়ে থাকে দেশটিতে মার্কিন অবস্থান লক্ষ্য করে। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে হামলার পর অবশ্য ইরাকী কর্তৃপক্ষ এ হামলার নেপথ্যে ইরানের হাত রয়েছে বলে দাবি করে। ইরান সে দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। এদিকে ইরাক ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন সেনারা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানিয়েছেন, ইরাকে মার্কিন বাহিনী চলতি বছরের শেষ নাগাদ তাদের লড়াই এর মিশন শেষ করবে। তবে এরপরও যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের সামরিক বাহিনীকে প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শ দিয়ে যাবে। বর্তমানে ইরাকে আড়াই হাজার মার্কিন সেনা আছে।

শান্তি ও স্থিতিশীলতা চায় ইরাক ও লিবিয়াবাসী

লিবিয়াবাসীরা এখন শান্তি ও স্থিতিশীল দেশ চায়। চায় সব বিদেশি সেনার প্রত্যাহার। তবে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিভক্ত লিবিয়ায় ঐক্য ও স্থিতিশীলতা আদৌ ফিরবে কি? যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ভেরিস্ক ম্যাপলেক্রফটের বিশ্লেষক হামিশ কিন্নের ভাষায়, ঐক্য সরকার গঠনের পর থেকে লিবিয়া এখন তুলনামূলক শান্ত। তবে নির্বাচন উত্তর পরিস্থিতির ওপর অনেককিছু নির্ভর করছে। এদিকে লিবিয়ায় শান্তি ফিরাতে শুধুমাত্র নির্বাচনের আয়োজনই যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন দেশটির শিক্ষাবিদ মাহৌদ খালফাল্লাহ। সম্প্রতি বিদেশি গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, প্রথমে প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশিদের হস্তক্ষেপ দূর করা, ভোটারদের পছন্দমত প্রতিনিধি নির্বাচনে গোষ্ঠীতন্ত্র ও আঞ্চলিকতাবাদ বর্জন এবং জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। খালফাল্লাহ বলেন, তা না হলে নির্বাচনের সুফল মিলবে না।

শেষের কথা

গাদ্দাফীর হত্যার পর গত এক দশকেও লিবিয়ায় কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও গণতন্ত্র ফিরেনি। সন্দেহ নেই পাশ্চিমা ভুল রাজনীতির শিকার আজ লিবিয়া ও ইরাক। দুটি দেশেরই ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় দুলছে। এখন সামনে নির্বাচনের মাধ্যমে লিবিয়ায় শান্তির প্রত্যাশায় আন্তর্জাতিক মহল। লিবিয়ার বর্তমান সংকট সমাধানের জন্য নির্বাচনকেই এই মুহূর্তে সেরা উপায় মনে করা হচ্ছে। আর এ কারণে নির্বাচনে সব পক্ষেরই অংশগ্রহণ চায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। আশার খবর হচ্ছে, নির্বাচনের আগে লিবিয়ার সব পক্ষের মধ্যে সহাবস্থান নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তৎপর। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে জাতিসংঘ জেনেভায় লিবিয়ার বিবদমান গোষ্ঠী সদস্যদের এক টেবিলে বসাতে সক্ষম হয় । নিজেদের পক্ষে লড়াই করা বিদেশি যোদ্ধাদের প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দেয় গোষ্ঠীগুলোর সদস্যরা। বর্তমানে ২০ হাজারের মতো বিদেশি যোদ্ধা রয়েছেন লিবিয়ায়। অন্যদিকে ইরাকে কী ঘটছে? সেখানেও শান্তি সুদূর পরাহত। দুই মাস আগে নির্বাচন হলেও সেই নির্বাচনের ফলাফল মানতে এখন নারাজ ক্ষমতাসীন মহল। এ নিয়ে সেখানে বিক্ষোভ চলছে। চলছে বোমাবাজি। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনেও ড্রোন হামলা হয়েছে। সাদ্দাম হোসেনকে হটানো ও ফাঁসি দেওয়ার এতবছর পরও সেই অনিশ্চয়তার দোলাচলেই ইরাক। আর কত রক্ত ঝড়বে ইরাকে? শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য আর কতোকাল অপেক্ষায় কাটাবে ইরাকবাসী? কোন পথে আজ লিবিয়া ও ইরাক? পশ্চিমা মদদে 'একনায়ক' হটানোর দাবি তোলা জনগণেরই বা রয়েছে কী প্রাপ্তি?

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ (চার রং)
৪০,০০০/-
২য় ও ৩য় প্রচ্ছদ (চার রং)
৩০,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
১৮,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
১০,০০০/-
ভিতরের সিকি পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
৬,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (চার রং)
২৫,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (চার রং)
১২,০০০/-
ভিতরের এক কলাম ৩" ইঞ্চি (সাদা কালো)
৩,০০০/-

বি. দ্র: একসাথে তিন মাসের জন্য ২৫%,
ছয় মাসের জন্য ৩৫% ও
এক বছরের জন্য ৫০% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে।

যোগাযোগ
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মাসিক পরওয়ানা
মোবাইল: ০১৭৯৯৬২৯০৯০

ভিজিট করুন
তাসনীম
www.tasneembd.org
▼কুরআন ▼হাদীস ▼আকীদা
▼ইবাদত ▼প্রবন্ধ ▼জীবনী
▼জিজ্ঞাসা▼বই

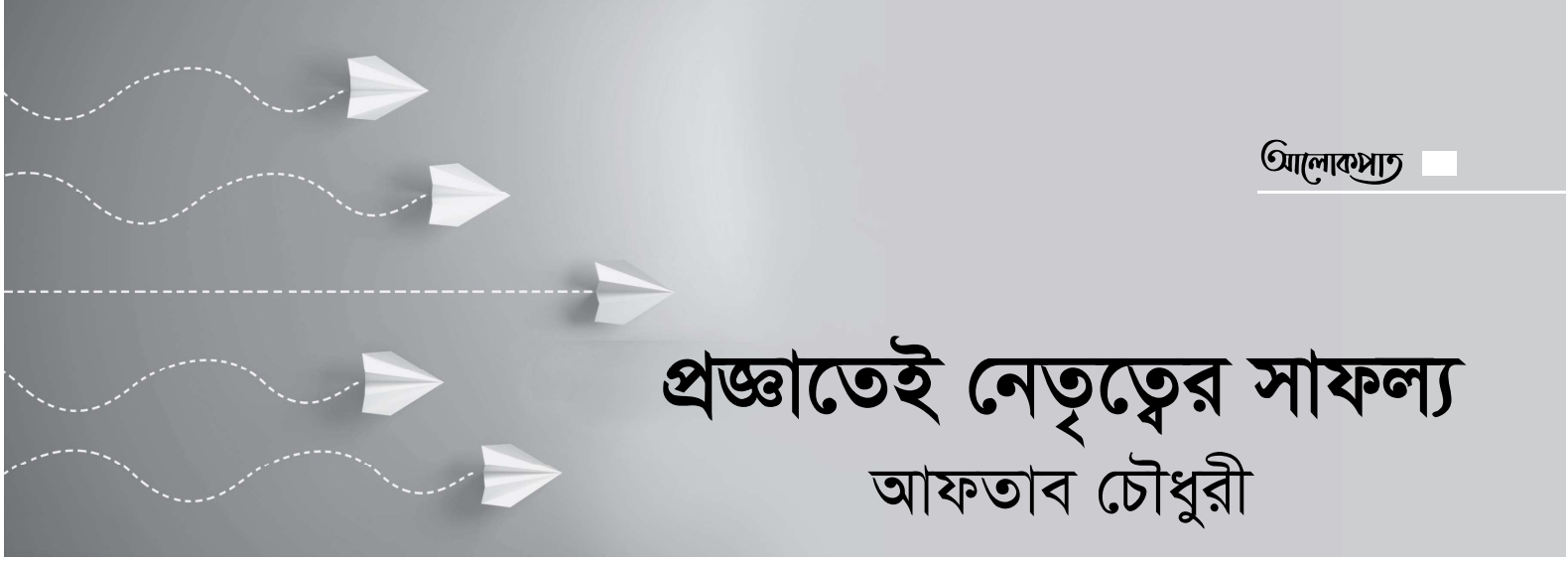

প্রজ্ঞাতেই নেতৃত্বের সাফল্য

আফতাব চৌধুরী

বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা। বিরাজমান রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ সম্পর্কে এর চাইতে সহজ ও সংক্ষেপ মন্তব্যবোধ আর হয় না। যা চলছে তাতে পোষাক চড়ানো হয়েছে গণতন্ত্র, সংবিধান. মানবাধিকার ইত্যাদি মনোহর বক্তব্যের। রাজনীতি দেশে আজ দুঃসাধ্যই নয়, দুঃসহ হয়ে উঠেছে। রাজনীতির প্রতি জনগণকে বীতশ্রদ্ধ করে তুললে তা গণবিমুখ হয়ে পড়ে এবং এমন অবস্থাই হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রতি চরম আঘাত। রাজনীতি হয়ে পড়ছে অস্ত্র ও অর্থনির্ভর। তাই নীতি ও আদর্শ, গণসম্পৃক্ততা, জনকল্যাণ ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে। শাস্তি ভোগ করছে সাধারণ জনগণ। দেশের অধিকাংশ মানুষের জায়গা জমি নেই, তারা দিনে আনে দিনে খায়।

একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাস্তবতার বিবেচনায়, জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিছু ছাড় ও বিরতি দিয়ে স্বস্তি দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তখন অবশ্য রাজনীতি ছিল প্রত্যয়ী রাজনীতিকদের নিয়ন্ত্রণে। কর্তৃত্ব ছিল ত্যাগী, আদর্শিক রাজনৈতিক কর্মীদের হাতে। বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হয় উদাসীন, না হয় ভ্রান্ত ধারণায় তৃপ্ত। ব্যতিক্রম যে এক্ষেত্রে নেই তা নয়, কিন্তু ভাব দেখে মনে হয় বাকীরা যেন সব সামলে উঠতে পারছেন না।

সংবাদপত্রের পাতা উল্টালেই বা টিভি অন করলেই দেখা যায় সহিংস ও অপরাধমূলক কার্যক্রম ক্রমেই ব্যাপকতা লাভ করছে, বাড়ছে দুর্ঘটনা ও মৃত্যু। জনগণের জান, মাল, ইজ্জতের নিরাপত্তা প্রায় নেই। বিরাজমান পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অপরাধীরা বেপরোয়া হয়ে উঠছে। ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো একে অন্যে দোষারোপ করছেন। কিন্তু দেশের তথা জনগণের হাল অবস্থা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোনদিকে যাচ্ছে তা মূল্যায়ন করছেন না। অনেকটা মনোভাব-দেখি কি হয়! কিভাবে সন্ত্রাসী, অপরাধী, চাঁদাবাজ, দুষ্কৃতিকারীদের নিয়ন্ত্রণ করা হবে, ভাব দেখে মনে হয় রাজনীতিবিদগণ বা প্রশাসন তা নিয়ে ভাবছেন না।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক হাল অবস্থা, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যেভাবে অবনতি হচ্ছে তা যদি সহসাই সামাল দেওয়া না যায় তাহলে দেশে যে কি অবস্থা হবে তা নিয়ে জনগণ শংকিত, আতংকিত, উৎকণ্ঠিত। জনজীবন দুস্কৃতিকারীদের হটাকারীতার নিকট বন্দী। হিংসা, প্রতিহিংসা বিদ্বেষ-জাতিকে কোথায় নিয়ে যাবে, গণতন্ত্র, মানবাধিকার কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌছবে, জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি দিয়ে রাজনীতিবিদদের তা যাচাই করতে হবে। সড়ক দুর্ঘটনার নামে যে হত্যাযজ্ঞ চলছে, দোষীদের শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে তা বন্ধ না করলে দিনে দিনে এরূপ হত্যাযজ্ঞ আরো বৃদ্ধি পাবে। নিরীহ, নির্দোষ মানুষ যন্ত্র দানবের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিবে তা মেনে নেয়া যায় না।

রাজনীতি জনগণের কল্যাণের জন্যই। রাজনীতিবিদগণই বলে থাকেন ব্যক্তির চেয়ে দল বড়-দলের চেয়ে জাতি বড়। দেশবাসী এ সংকটময় মুহূর্তে তার প্রামাণ চায়। নৈরাজ্যের মধ্যে একটি জাতি বেঁচে থাকতে পারে না। তেমন পরিস্থিতিতে একটা তৃতীয় শক্তি যাতে সুযোগ না পায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। দেশের সাধারণ মানুষ কিন্তু শান্তি চায়, নিরাপদ জীবন-ব্যবস্থা চায়। ভয়-ভীতি, উত্তেজনা, অস্থিরতার মধ্যে মানুষ বাঁচতে পারেনা। ডুবন্ত মানুষও বাঁচার আগ্রহে খড় কুটোকে যেমন আকড়ে ধরতে চায়, অসহায় মানুষও অবাঞ্চিত পরিবেশকে কিছুকালের জন্য মেনে নেয়, স্থায়ীভাবে নয়। এখানেই কোন কোন দল বা রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা। এ ব্যর্থতা তাদের জীবনে নিয়ে আসে নির্মম পরিণতি। ইতিহাস তাদের ক্ষমা করে না-করবেনা, করতেও পারেনা। জাতীয় জীবনের এ দুর্যোগে আমরা আশা করব, আমাদের সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চিন্তা চেতনায় শুভবুদ্ধির উদয় হবে, জাতিকে আত্মহননের পথ থেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা চালাবে।

অন্যদিকে পরিস্থিতির অবনতি লক্ষ্য করেও ব্যবস্থা গ্রহণে সময় ক্ষেপণ করা হলে অবনতি দ্রুত হয়। প্রতিপক্ষ দুঃসাহসী ও শক্তিশালী হয়, পরিস্থিতি এ সময় আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। পরিস্থিতিকে সময়ের হাতে ছেড়ে দেওয়া প্রজ্ঞার পরিচায়ক নয়। জনগণকে একসময় যতই অসহায় মনে করা হোক না কেন-জনগণই সরকারকে ক্ষমতায় বসায়। জনগণের শক্তি অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে যে নৈরাজ্য নেমে আসে তা কারো জন্য কল্যাণকর হতে পারে না-ইতিহাস এর সাক্ষী। কোন শক্তিধর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীই গণজোয়ার ঠেকাতে পারেনি এবং পারবেওনা। নেতৃত্বহীন, নিয়ন্ত্রণহীন গণঅভ্যুত্থান ব্যাপক ধ্বংস নিয়ে আসে যা মোটেই কাম্য নয়। এ গণশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখাই নেতৃত্বের পরিচয়।

মূলকথা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সারাদেশে বর্তমানে যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে সহজেই বলা যায়, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নৈরাজ্যের দ্বারে উপনীত। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় বের করতেই হবে।

আমি রাজনীতি করি না-কিন্তু সচেতন মন দিয়ে অন্ততঃ এটা বুঝি, ধরাবাধা কাঠামোর মধ্যে রাজনীতি সবসময় চলে না। অবস্থাভেদে পরিবর্তন হয়। লক্ষ্য অর্জনের জন্যেই এর প্রয়োজন। জেদ রাজনীতির ভাষা নয়। এটা একনায়ক ও স্বৈরাচারের বেলায় সাজে। নমনীয়তা দুর্বলতা নয়-কৌশল হিসাবেও বিবেচিত। প্রজ্ঞাতেই নেতৃত্বের সাফল্য। জনগণের আস্তাতেই নেতৃত্বের স্থায়িত্ব, না কি ভুল বললাম?

র‌্যাগ ডে
নতুন অপসংস্কৃতির আমদানী

আহসান উদ্দিন

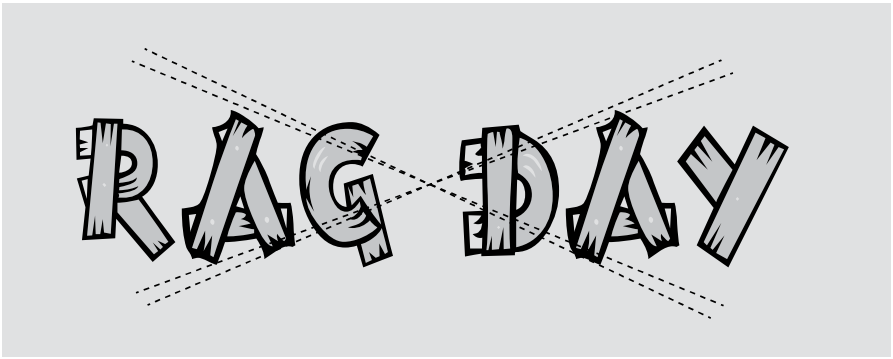

অনেকেই হয়ত র‌্যাগ ডে বিষয়টি কী এটা জানেন না, আবার অনেকে র‌্যাগ ডে ও র‌্যাগিংকে একই বিষয় মনে করেন। ইদানীং বাংলাদেশে এই র‌্যাগ ডে নিয়ে অনেক আলোচনা সমালোচনা শোনা যাচ্ছে। এই র‌্যাগ ডে কী? ইসলামের দৃষ্টিতেই বা এর বিধান কেমন? এ বিষয়ে পাঠকের সামনে কিছু আলোচনা তুলে ধরবো।

র‌্যাগ ডে (RAG Day) এটা সর্বপ্রথম শুরু হয় ১৯২৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায়। পরবর্তিতে এশিয়ার মধ্যে ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‌্যাগ ডে ব্যাপকভাবে শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশে এই র‌্যাগ ডে অনুষ্ঠান আয়োজন হচ্ছে। বাংলাদেশে আজ থেকে ৪-৫ বছর আগেও র‌্যাগ ডে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সীমাবদ্ধ ছিলো কিন্তু তা বর্তমানে স্কুল কলেজেও ছড়িয়ে পড়েছে।

ইন্টারনেটে ঘেঁটে যতদূর জানা যায়, এটি গ্রীক কালচার। সপ্তম-অষ্টম শতকে খেলার মাঠে টিম স্পিরিট নিয়ে আসার জন্য র‌্যাগিংয়ের প্রচলন শুরু হয়। র‌্যাগ শব্দটি মূলত ইংরেজি র‌্যাগিং থেকেই এসেছে। আর ইউরোপে প্রচলন ঘটে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি। ১৮২৮-১৮৪৫ সালের দিকে র‌্যাগ সপ্তাহের প্রচলন ঘটে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। বিশেষ করে ছাত্র সংস্থা- পাই, আলফা, বিটা, কাপ্পা এই সপ্তাহটির প্রচলন ঘটাতে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। র‌্যাগ ডের বর্তমান প্রচলিত অর্থ হলো শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হৈ-হুল্লোড়ের দিন। মজার ব্যাপার হলো, ইউরোপ-আমেরিকায় এর যাত্রা হলেও বর্তমানে এশিয়াতেই এর ব্যবহার সর্বাধিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে শিক্ষার্থীরা এ দিনে নানা আয়োজন করে। শিক্ষার্থীরা সেদিন একসাথে ছবি তোলে, কেউ ব্যান্ড পার্টি এনে বাজায় কিংবা কেউ রং মাখামাখি করে,কেউ ডিজেবক্স বাজায় ও নাচানাচি করে। স্কুলে দশম শ্রেণিতে এসএসসির আগে ও কলেজে দ্বাদশ শ্রেণিতে এইচএসসির আগে র‌্যাগ ডে হয়ে থাকে।

বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে র‌্যাগ ডে অনুষ্ঠান হয়। বছর দেড়েক আগেও স্কুল কলেজে অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির মডেল টেস্ট পরীক্ষার আগে সমাপনী ক্লাস অনুষ্ঠিত হতো। ২০১৬ সালের আগে স্কুল ও কলেজে র‌্যাগ ডে নামে কোনো অনুষ্ঠান হত না।

এক সময় আমাদের দেশে সুন্দর করে স্কুলের শেষ দিনটি পালন করা হতো। ছাত্ররা শিক্ষকের কাছ থেকে দুআ নিতো, শিক্ষাঙ্গনে একসাথে দীর্ঘ সময় কাটানোর পর বন্ধুরা একে অপরকে ছেড়ে যাওয়ার কষ্টে চোখের পানি ফেলতো। সামনে পরীক্ষার কথা চিন্তা করে সবাই দুআ-মুনাজাতে লিপ্ত থাকতো। বিভিন্ন ধরনের খাবারের আয়োজন হতো। অথচ আজ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে আমাদের নীতি-নৈতিকতা ও সংস্কৃতি!

বর্তমানে র‌্যাগ ডে তে অনেক স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায় সাদা গেঞ্জি টি শার্ট পরিধান করে শিক্ষার্থীরা। সেই টিশার্টের গায়ে মার্কার কলম দিয়ে অনেক শব্দ লেখে। এমনকি সেখানে অনেক অশালীন শব্দ লিখতেও দেখা যায়। স্কুলে যেদিন দশম শ্রেণির র‌্যাগ ডে হয় সেদিন অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্লাস শ্রেণি পাঠদানে স্বাভাবিকভাবে ব্যাঘাত ঘটে। র‌্যাগ ডে মূলত শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে হয়। সেখানে দুয়েকজন শিক্ষার্থী বক্তৃতা দেয় তারপর কেক কাটে, মধ্যাহ্নভোজ হয় এবং নাচ গান বাজনা চলে। ইদানীং চালু হওয়া এই র‌্যাগ ডে কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আপত্তিকর অভিযোগ শোনা যায়। দেশের অসংখ্য স্কুল কলেজে ছেলে মেয়ের মাঝে কোন ধরনের পার্থক্য না রেখে, বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি গানে নাচানাচি, একে অপরকে রং মাখিয়ে দেওয়া, অন্যের কাপড়ে অশালীন বাক্য লিখে দেওয়াসহ বেশকিছু ঘটনা চোখে পড়ছে যা দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সর্বোপরি ধর্মীয় আদর্শ বিরোধী। তরুণ শিক্ষার্থীদের মাঝে এসব ঘটনা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতাও ব্যাপক। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির মত অপ্রীতিকর ঘটনাও সামনে এসেছে। অনেক স্কুল-কলেজে দেখা যায় যেদিন বিদায়ী অনুষ্ঠান হয় সেখানে কুরআন তিলাওয়াত, হামদ নাত দেশাত্মবোধক গান-গজল, শিক্ষকদের বক্তৃতা এবং দুআ মুনাজাত হয়, ছাত্ররা শিক্ষকদের কাছে দুআ চায়। কিন্তু এই বিদায়ী অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার ২০-৩০মিনিট পরে কিছু ছাত্র কলেজের কতিপয় বড় ভাইদের সাহায্যে র‌্যাগ ডে করে থাকে, সেখানে ডেক্সেটে গান মিউজিক বাজায়, নাচানাচি চলে ও রং ছিটায়। আবার অনেক কলেজে র‌্যাগ ডে ও বিদায়ী সংবর্ধনা পৃথক দিনে হয়।

ইদানীং প্রচলিত র‌্যাগ ডের কারণে স্কুল কলেজের বিদায়ী অনুষ্ঠান বিলীন হতে শোনা যাচ্ছে যা খুবই দুঃখজনক। গত দুই তিন বছর যাবত দেখা গেছে যে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে অসংখ্য সরকারি ও বেসরকারি স্কুল কলেজে রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে হামদ নাত, মীলাদ ও দুআ মাহফিল অনুষ্ঠান না হলেও প্রতিবছর র‌্যাগ ডের মত অনুষ্ঠান হয়। ইদানীং স্কুল পর্যায়ে অষ্টম শ্রেণিতেও এই র‌্যাগ ডে ঢুকেছে। সম্প্রতি এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ঢাকা ও তার আশপাশের জেলা শহরের অধিকাংশ স্কুলগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের র‌্যাগ ডে এর নমুনায় অনেক শিক্ষার্থীরা হৈহুল্লোড় করেছে। অবাক হয়েছি এটা শুনে যে, মেয়ে শিক্ষার্থীরা এখানে যৌন হয়রানির শিকারও হয়েছে। হিন্দুদের হোলি উৎসবের মতো করে সেখানে রং ছিটানো হয়। এসব কি আদৌ আমাদের বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অংশ? এসব কি আমাদের বাংলাদেশি সংস্কৃতির অংশ? কখনোই নয়। র‌্যাগ ডের নামে যেসব উদ্ভট কর্মকান্ড হয় সেগুলোর সাথে ইসলামী ভাবধারা ও বাঙালি-বাংলাদেশি সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক নেই। মূলত র‌্যাগ ডের নামে এসব অপসংস্কৃতির মাধ্যমে ইসলামী ও বাঙালি-বাংলাদেশি সংস্কৃতি

(এরপর পৃষ্ঠা ৩৫ এ দেখুন)

বিলীন করার ভয়ংকর অপচেষ্টা চলছে। শিক্ষাঙ্গনে এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে অনেকেই সমালোচনা করেছেন। এসব দেখে অনেকে বলেছেন, নৈতিকতা ও সংস্কৃতি যখন আধুনিকতার নামে বন্দী করা হয়েছে, তখন অপসংস্কৃতির ভয়ানক অপব্যবহার গ্রাস করে নিচ্ছে শিশু-কিশোর তরুণ-যুবকদের। একসময় এসএসসি পরীক্ষা দিতে যাওয়া শিক্ষার্থীরা বড়দের দুআ এবং ধর্ম পালন করে ভালো ফলাফলের চেষ্টা করত; আজ সেখানে গান বাজনা নাচ-নষ্টামির মাধ্যমে উল্লাস করতে দেখা যায় র‍্যাগ-ডে নামক অনুষ্ঠানে। এ বিষয়ে সম্প্রতি জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দীন আহমেদ গণমাধ্যমকে বলেছেন, আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিরোধী সবকিছু পরিহার করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কখনোই করা উচিত নয় যা অন্যের চোখে নিজের জন্য লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং বাবা-মাকে পরবর্তীতে এর কারণে অপমানবোধ করতে হয়। তিনি বলেন, 'সামাজিক মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করার, অন্যের থেকে নিজেকে ফুটিয়ে তোলার একধরণের প্রবণতা দেখা যায়; এই প্রবণতা এক ধরণের আচরণগত আসক্তি। মাদক গ্রহণ করাই শুধু আসক্তি নয়, তরুণদের সাথে সামাজিক মাধ্যমে নিজেকে ফুঠিয়ে তোলার যেই প্রবণতা এটিও এক ধরণের আচরণগত আসক্তি। এসব পরিহার করা উচিত' ।

ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির প্রফেসর শাহেদ হারুন বলেন, 'শিক্ষাঙ্গনে বিজাতীয় সংস্কৃতি বন্ধে বিদ্যালয় প্রশাসনের পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসনের পদক্ষেপই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। প্রশাসনের কারণেই বুয়েট এবং বেশকিছু বিদ্যালয়ে এসব বন্ধ হয়েছে'। 'তারুণ্য উন্মাদনা ও পাগলামিরই অংশ' এই উদ্ধৃতি টেনে তিনি বলেছেন; 'তরুণদের মাঝে উচ্ছ্বাস-উন্মাদনা থাকবেই, তবে এসব নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনকেই পদক্ষেপ নিতে হবে। চাই তা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন হোক বা স্কুল প্রশাসন। তিনি মনে করেন, এক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করলেই তা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় নীতি-নৈতিকতার প্রতি আগ্রহী করতে হবে। তাদের মাঝে জাতিসত্ত্বা, সংস্কৃতিবোধ ও সচেতনতা তৈরি করতে হবে'। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিধি-নিষেধ আরোপের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের মাঝেও তা মানার মানসিকতা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে সচেতনতামূলক সেমিনার, বিতর্ক অনুষ্ঠানও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। এই শিক্ষাবিদ আরো বলেন, 'র‍্যাগ- ডে'র নামে যা কিছু ঘটছে এসব অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গনের বাইরে ঘটে থাকে, তাই এসবের জন্য শিক্ষার্থীদের যথাযথ জবাবদিহীতার আওতায় আনার মাধ্যমেও তা বন্ধ হতে পারে'।

এদিকে রাজধানীর মাইলস্টোন কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ ছফিউল্লাহ হাশেমী এ বিষয়ে বলেছেন, 'কোন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কখনোই চান না শিক্ষার্থীরা নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ুক। তরুণদের বয়সটাই এমন যে তাদের গভীরভাবে কোন কিছু ভাবার সুযোগ থাকে না। বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, স্যাটেলাইট চ্যানেলের প্রভাবে তরুণদের সামনে রঙিন আলো ঝলমলে দুনিয়া হিসেবে যা উপস্থাপন করা হচ্ছে তারা সেটাকেই গ্রহণ করতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। তবে আমাদের তরুণদের নিজস্ব সংস্কৃতি, এতিহ্য, শেকড় ও দ্বীন ধর্ম আগলে ধরার গুরুত্ব বোঝানো উচিত। পাশ্চাত্যের যা কিছু ভালো তা আমরা গ্রহণ করব; কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও শালীনতা বিরোধী কিছু থাকলে তা অবশ্যই পরিত্যাগ করা কর্তব্য'।

র‍্যাগ ডের নামে ইদানীং যেসব কর্মকান্ড শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হয় সেগুলো ইসলামের দৃষ্টিতেও কেবল নিন্দনীয়ই নয় বরং নিষিদ্ধ। কুরআন সুন্নাহর আলোকে সর্বপ্রকারের অশ্লীলতা ও বেহায়াপানা বর্জনীয়। যেসব অনুষ্ঠানে এসব হয় সেগুলো থেকে বিরত থাকারও নির্দেশনা এসেছে। এজন্য অনেক দ্বীনদার মুসলিম শিক্ষার্থীরা র‍্যাগ ডে কে এড়িয়ে চলে।

আল্লাহ তাআলা বাণী প্রদান করেন,

وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا۟ بِٱللَّغْوِ مَرُّوا۟ كِرَامًا

-(আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ তারাই) এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়। (সূরা আল ফুরকান, আয়াত-৭২)

আমর ইবন শুআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছাড়া অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য করো না। কেননা ইয়াহুদীরা অঙ্গুলির ইশারায় সালাম দেয়, আর খ্রিষ্টানরা হাতের তালু দ্বারা সালাম করে। (জামে আত তিরমিযী-২৬৯৫)

আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত (হয়ে যাবে)। (আবূ দাউদ- ৪০৩১)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র অশ্লীলতা, অপসংস্কৃতি বর্জনের তাওফীক দান করুন।

Al Arab Tailors

মো. আনোয়ার হোসেন
প্রোপ্রাইটর

আল আরব টেইলার্স
পাঞ্জাবী স্পেশালিস্ট

১১৮, করিম উল্লাহ মার্কেট (নিচ তলা) 01734-346601
বন্দর বাজার, সিলেট

ভারত সফরে কয়েকদিন

রুহুল আমীন খান

পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান কুতুবুদ্দীন আইবেক দিল্লীতে প্রতিষ্ঠা করেন একটি মসজিদ। তার নাম দেন কুওতুল ইসলাম। এর ১৬০ ফুট দূরে শুরু করেন একটি মিনার নির্মাণের কাজ। কিন্তু শেষ করে যেতে পারলেন না কুতুবুদ্দীন। তাঁর ইন্তিকালের পর সুলতান হলেন তার জামাতা ইলতুতমিশ। তিনিই সমাপ্ত করলেন নির্মাণ কাজ (১২৩১-৩২ খ্রি.) এবং তাঁর পীর হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র.) এর নামানুসারে নামকরণ করলেন 'কুতুবমিনার'।

(পূর্ব প্রকাশের পর)

'অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করে মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।'

দিল্লী সফর সাঙ্গ করে এরকম একটা অনুভূতিই জাগল। এখানের সফরতো শেষ হলো কিন্তু দেখা শেষ হলো না। অতৃপ্তি রয়েই গেল অন্তরে। এই অতৃপ্তির মধ্যে বিশেষভাবে ছিল কুতুবমিনার না দেখার বেদনা। আমাদের গাইড, মিঃ চাটার্জিকে সে কথা জানালে তিনি বললেন, দুঃখের কারণ নেই, আগ্রা যাবার পথেই কুতুবমিনার। দেখে নেয়া যাবে একনজর। হাযির হলাম কুতুবের পাশে। স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন কুতুবমিনার। এটি ২০০৬ সালে সর্বোচ্চ পরিদর্শিত সৌধ। পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৩৮.৯৫ লাখ। যা ছিল তাজমহলের চেয়েও বেশি। তখন তাজের পর্যটক সংখ্যা ছিল ২৫.৪ লাখ। এর আশেপাশে বেশ কিছু প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় স্থাপনা এবং ধ্বংসাবশেষ রয়েছে যা একত্রে 'কুতুব কমপ্লেক্স' হিসেবে পরিচিত। পৃথিবীর এ জাতীয় সুন্দরতম সৌধরাজির মধ্যে এটি একটি। পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান কুতুবুদ্দীন আইবেক দিল্লীতে প্রতিষ্ঠা করেন একটি মসজিদ। তার নাম দেন কুওতুল ইসলাম। এর ১৬০ ফুট দূরে শুরু করেন একটি মিনার নির্মাণের কাজ। কিন্তু শেষ করে যেতে পারলেন না কুতুবুদ্দীন। তাঁর ইন্তিকালের পর সুলতান হলেন তার জামাতা ইলতুতমিশ। তিনিই সমাপ্ত করলেন নির্মাণ কাজ (১২৩১-৩২ খ্রি.) এবং তাঁর পীর হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র.) এর নামানুসারে নামকরণ করলেন 'কুতুবমিনার'। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম স্মৃতিসৌধসমূহের মধ্যে কুতুবমিনার অন্যতম। এর উচ্চতা প্রায় ২৪০ ফুট। সর্বসমেত সোপান সংখ্যা ৩৭৯। ভূমি অংশের ব্যাস ১৪.৩২ মিটার। নির্মিত হয় লোহিতবর্ণ বেলে পাথরে। মিনারটিতে আছে ৫টি তলা। উপর দিকে ক্রমশ সরু। নীচের ৪ তলায় রয়েছে ঝুলন্ত বারান্দা। আগে এটি ৪ তলাই ছিল। ফিরোজ শাহ তুঘলক মেরামতকালে বর্ধিত করেন ৫ম তলাটি। তিনি উপরের ২টি তলা সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে নির্মাণ করেন। মিনারটি ক্রমশঃ নিচ থেকে মোটা হতে সরু। দিল্লীর জামে মসজিদ এবং তাজমহলের মিনারও এমনি নিচ থেকে উপর সরু। দৃঢ়তা বা ভারসাম্যের প্রয়োজনে এমনটা করা হয়েছে। মিনারগাত্র মসৃণ গোলাকার নয়, খাজ কাটা খাজ কাটা। তাতে উৎকীর্ণ রয়েছে পবিত্র কুরআনের আয়াত।

এবার আগ্রার পথে সেই প্রাচীনকাল থেকে 'রণধারা বাহি, জয়গান গাহি, উন্মাদ কলরবে এগিয়ে। চলেছে কত অভিযাত্রী দল। দূর-দূরান্তে পাড়ি জমিয়েছে কত কারাভান, কত সওদাগরি কাফেলা। সেকালে বাহন ছিল উট, গাধা। পথ ছিল বন্ধুর। আধুনিক যুগ পথকে করেছে মসৃণ। শ্রম করেছে লাঘব। ভ্রমণ করেছে আরামপ্রদ। বাহন করেছে সুবিলাশ গতিময়। চলায় দিয়েছে ছন্দ। বৈচিত্র্যে করেছে ভরপুর। আগে পথের দু ধার ছিল উষর ধূসর, এখন সবুজ শ্যামল। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে করে, পিচঢালা মসৃণ পথ বেয়ে অবশেষে হাযির হলাম ইতিহাস-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ আগ্রায়।

দিল্লী থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত আগ্রা। যমুনার বামতীরে প্রাচীন আগ্রা ছিল লোদী বংশের ও সম্রাট বাবরের রাজধানী। নদীর ডান তীরের আগ্রাকে সম্রাট আকবর মোগল

সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠা করেন ১৫৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। ১৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রাজধানী সেখান থেকে স্থানান্তরিত করে নিয়ে যান ফতেহপুর সিক্রিতে। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের পুনরায় সেখান থেকে রাজধানী নিয়ে যাওয়া হয় লাহোরে। ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দে আবার রাজধানী নিয়ে আসা হয় আগ্রায়। সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন দিল্লীতে। ১৮০৩ সালে ২য় মারাঠা যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা অধিকার করে নেয় আগ্রা। ১৮৮৫ সাল থেকে এটি একটি প্রাদেশিক রাজধানী। মর্মর পাথর ও চামড়ার কুটির শিল্পের জন্যও আগ্রা বিখ্যাত। এখানে ঐতিহাসিক সৌধরাজির মধ্যে রয়েছে আকবরের দুর্গ, শাহজাহানের মতি মসজিদ, আওরঙ্গজেবের দেওয়ানে খাস, দেওয়ানে আম, শীশ মহল, জাহাঙ্গীর মহল, ইতিমাদুদদৌলার সমাধিসৌধ। আর সবার সেরা দুনিয়ার সুন্দরতম সৌধ তাজমহলতো রয়েছেই।

রাত কাটালাম হোটেল মানসিংয়ে। আগ্রায় পৌঁছা থেকে চুম্বকের মত টানছিল তাজ। সেই শৈশব থেকে কত শুনেছি তাজের কথা। কত পড়েছি তাজের বিবরণ। কত দেখেছি তাজের ছবি। কত কল্পনা করেছি তাজকে নিয়ে। কিন্তু প্রধান ফটক অতিক্রম করে তাজের মুখোমুখি যখন হলাম তখন এতদিনকার সব ভাবনা-কল্পনার ঊর্ধ্বে তাজকে মনে হলো অন্য কিছু। যার রূপ, সৌন্দর্য, মহিমা অপূর্ব, অনবদ্য। তার নান্দনিকতা, তার শিল্প সুষমা, তার ভাবগাম্ভীর্য যে অনুভূতির জন্ম দেয়, সেই সুখানুভূতি অনির্বচনীয়। শুধু তন্ময় হয়ে সেই রূপসুধা পান করা যায়, বর্ণনা করা যায় না। প্রথম দৃষ্টিতে সকলেই অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও অপলক, হতবাক হয়ে যায়। এমন নিপুণ, এমন নিখুঁত, তিল তিল উত্তমকে একীভূত, কেন্দ্রীভূত করা এমন তিলোত্তমা বিশ্বভুবনে আর দ্বিতীয়টি নেই। সত্যিই এ অনুপম, সত্যিই এ বেনযীর। এজন্যই দুনিয়ার ৭ আশ্চর্যের এক আশ্চর্য, সকল সুন্দর প্রাসাদের সুন্দরতম, শ্রেষ্ঠতম প্রাসাদ তাজমহল।

না, বোধহয় ঠিক বলা হলো না। একি শুধু শ্বেতমর্মর গ্রথিত, মণিমুক্তা বিখচিত, কারুকার্যে সুশোভিত এক অপূর্ব অট্টালিকা? একি শুধু এক কালজয়ী প্রাসাদ? একি শুধু এক বিস্ময়কর স্থাপত্য? না। এ যে মূর্তমান রূপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে স্বর্গীয় প্রেম, নান্দনিক ভালোবাসা। বেহেশতী মুহাব্বত। এ যে এক সম্রাট কবির অমর প্রেমকাব্য।

পাথরের অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে, মণিমুক্তোর পঙক্তির পর পঙক্তি বিন্যাস করে, রতন জওহেরাতের স্তবকের পর স্তবক গ্রথিত করে সম্রাট কবি রচনা করেছেন এই কালজয়ী কবিতা। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ এর প্রতিটি ভাস্কর্যে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে সেই প্রেম, সেই ভালোবাসা।

সত্যিই হে তাজমহল!

"তোমার সৌন্দর্য দূত যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী।
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া
ভুলিনাই ভুলিনাই ভুলিনাই প্রিয়া।
তুচ্ছ করি রাজ্য ভাঙা গড়া
তুচ্ছ করি জীবন মৃত্যুর উঠাপড়া
যুগযুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া
ভুলিনাই ভুলিনাই ভুলিনাই প্রিয়া।"

হ্যাঁ, বিলীন হয়ে গেছে আসমুদ্র হিমাচল মোগল সাম্রাজ্য। খতম হয়ে গেছে প্রভাব প্রতাপ ক্ষমতাদর্প। নিঃশেষ হয়ে গেছে হিরে রত্ন ধন ঐশ্বর্য। এটাই নিঠুর কালের অমোঘ বিধান। প্রেমিক সম্রাটও একথা জানতেন ভালোভাবেই। জানতেন–

"হিরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্র ধনুচ্ছটা।"

তাই সম্রাট স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেসব কিছু-

"যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক
এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।"

আর এ তাজের মধ্য দিয়ে সম্রাট কবি-

"জ্যোৎস্না রাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।"

প্রথম দর্শনের যে ভাব-বিহ্বলতা, যে তন্ময়তা, যে ঘোর, তা কাটল ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দে। এবার তাকালাম পাথরের তাজের দিকে। সম্রাট শাহজাহান। অপরূপ সুন্দরী আরজুমন্দ বানু– বেগম মমতাজ মহল কেবল সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী নন তার হৃদয়েরও রাণী। এই সম্রাজ্ঞী সম্রাটকে শোকসাগরে ভাসিয়ে চিরদিনের মত বিদায় নিলেন ১৬২৯ সালে। বিরহকাতর সম্রাট সিদ্ধান্ত নিলেন প্রিয়তমা পত্নীর স্মৃতি চির অমর করে রাখার। পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন তাজ গড়ার। যমুনা তীরে হলো স্থান নির্বাচন। তৈরী হলো নকশা। দেশ-বিদেশ থেকে আনা হলো প্রখ্যাত সব স্থপতি শিল্পীদের। প্রধান স্থপতির সম্মান পেলেন উস্তাদ ঈসা। জড়ো করা হলো মণিমাণিক্য জওহেরাত, মূল্যবান মর্মর পাথর। শুরু হলো নির্মাণ কাজ। ২০ হাজার শ্রমিকের ২২ বছরের অক্লান্ত সাধনায় স্থাপিত হলো পৃথিবীর সুন্দরতম স্মৃতিসৌধ তাজমহল।

ওই সে অপূর্ব তাজ। চারদিকে প্রাচীরবেষ্টিত মনোরম উদ্যানের অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে। উদ্যানটি সুশোভিত বহু ফোয়ারায়। মূল প্রাসাদের তিনদিক বেষ্টন করে আছে গাঢ় শ্যামল সাইপ্রাস বৃক্ষশ্রেণি। তাজের সামনে রয়েছে মার্বেল পাথরে নির্মিত এক মনোরম চৌবাচ্চা। তার পানির মধ্যে তাজ প্রতিবিম্বিত হয়ে ধারণ করে অপূর্ব শোভা। ওই সামনে অনিন্দ সুন্দর সৌধ। ৩১৪ ফুট বাহু বিশিষ্ট ১৮ ফুট উঁচু মঞ্চ। মঞ্চের চারকোণে শ্বেত মর্মর নির্মিত চারটি সুদৃশ্য মিনার। প্রতিটির উচ্চতা ১৩৩ ফুট। মূল ভবন একটি বর্গক্ষেত্রের উপরে দাঁড়ানো ১৮৬ ফুট বাহুবেষ্টিত। চারদিকে চারটি দরজা প্রতিটি দিকের মধ্য বরাবর। সম্মুখ ভাগের মাঝেরটি সুউচ্চ সিংহ দরজা। শীর্ষদেশে তিনটি সুদৃশ্য গম্বুজ। মাঝেরটি পাশের দুটি থেকে উঁচু। উচ্চতা এর ২১০ ফুট, ব্যাস ৫৮ ফুট। গম্বুজের অগ্রভাগ ক্রমশ সরু। সেখানে সংযোজিত হয়েছে একফালি নয়া চাঁদ। পুরো সৌধটি নির্মিত শ্বেতমর্মরে। বহির্দেশে বহুমূল্য পাথরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকাজ। তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফুলের মত সুন্দর আরবী তোগরা হরফে উৎকীর্ণ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত। তোরণ দিয়ে প্রবেশ করতে হয় ভিতরে মূল প্রকোষ্ঠে। অষ্টকোণ বাহুবিশিষ্ট প্রকোষ্ঠটি। দেয়ালে দেয়ালে তার আরো মনোরম, আরো বিচিত্র নকশা। এসব নকশা তৈরী করা হয়েছে দুষ্প্রাপ্য সব মণিমাণিক্যে। এ্যাগেট, জ্যাসপার, ব্লাডস্টোন আরো কত অমূল্য পাথর দিয়ে ফুটানো ফুল, কুঁড়ি, পত্র পল্লব। দেয়ালের উঁচুতে জটিল দুই স্তরবিশিষ্ট জালির জানালা। মূল প্রকোষ্ঠের মাঝে পাশাপাশি সম্রাট শাহজাহান ও সম্রাজ্ঞী আরজুমন্দ বানু বেগম মমতাজের কবর। কবরের গায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মণিমুক্তার কারুকাজ। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎকীর্ণ আরবী তোগরা লিপিকায় পবিত্র কুরআনের আয়াত। কিন্তু দৃশ্যমান এ কবর মূল কবর নয়। মূল কবর নীচে ভল্টের মধ্যে। উপরে তার সুদৃশ্য অনুকৃতি।

হালকা ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই বৃষ্টিভেজা বাঁয়ের লোহিত পথ ধরে এগিয়ে চললাম তাজের দিকে। নিচে জুতো জমা দিয়ে সোপান বেয়ে উঠতে লাগলাম মঞ্চে, যেখান থেকে পরম রমণীয় প্রাসাদটি উত্থিত। কিন্তু সোপানরাজির পাশে পাশে জমেছে সবুজ শ্যাওলা। বড় বেমানান! বড় বিসদৃশ্য! তাজের নেয়া যেত আরো অধিক যত্ন। সার্বক্ষণিক পরিচর্যায় রাখা যেত সদা ঝকঝকে তকতকে। সামনেরটি রাখা যেত আরো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ফোয়ারার পানির ধারা রাখা যেত সদা উৎক্ষিপ্ত। জলাধার দু'পাশের রুগ্ন পত্রপল্লববিহীন সাইপ্রাস বৃক্ষটি বদলে দেওয়া যেত তরতাজা গাঢ় শ্যামল সাইপ্রাস দিয়ে। মরে যাওয়া বৃক্ষের শূন্য স্থানটি সদা পূরণ করে রাখা সম্ভব ছিল জীবন্ত প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে। বাইরে অনুরূপ জন্মিয়ে তা প্রতিস্থাপন অসম্ভব নয় মোটেই। এভাবে উদ্যান- যৌবন চির অটুট রাখা, রমণীয় রাখা অসাধ্য ছিল না। এ অবস্থাদৃষ্টেই বোধকরি জনাব এ এম এম বাহাউদ্দীন মন্তব্য লিখলেন "ভারত সরকারের উচিৎ মুসলিম পুরাকর্তিসমূহ সুরক্ষায় আরো অধিক যত্নবান হওয়া, বিশেষ করে তাজমহলের ক্ষেত্রে।" পর্যটনে ভারতের আয়ের অংক বিপুল। তাজ দর্শক এক একজন বিদেশী পর্যটকের নিকট থেকে দর্শনী ফি নেয়া হয় ৭৫০ ভারতীয় রূপি।

উপরে উঠে বিষাদিত মন পুনঃসিক্ত হলো তাজের সৌন্দর্যসুধায়। সিংহদ্বার দিয়ে মূল প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে বয়ে এগিয়ে প্রেমিক দম্পতির কবরের কাছাকাছি হয়ে পাঠ করলাম ফাতিহা। বেরিয়ে পেছনের দিকে এসে তাজকে পশ্চাতে রেখে তাকালাম সামনে। ধীরে বইছে যমুনা। বছরে এর দর্শক সংখ্যা ৭০ থেকে ৮০ লাখ। তাজের নির্মাণশৈলীতে ঘটানো হয়েছে পারস্য, তুরস্ক, ভারতীয় ও ইসলামী স্থাপত্য শিল্পের সম্মিলন। ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য তাজের ডানে ও বায়ে নির্মাণ করা হয়েছে একই আকৃতির দুটি দৃষ্টিনন্দন ইমারত। তার একটি হচ্ছে মসজিদ। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের সর্বদলীয় প্রশংসিত শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে তাজকে। এর অপর পারে রয়েছে সম্রাটের 'কৃষ্ণতাজ' নির্মাণের সেকালের নেয়া প্রাথমিক প্রস্তুতির কিছু চিহ্ন। বিরহী শাহজাহানের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাজের ঠিক সোজাসোজি যমুনার ওপারে হুবহু আর একটি তাজ গড়ার। এ তাজ শ্বেত মর্মরের আর ওপারের তাজ হবে কৃষ্ণ মর্মরের। শ্বেততাজ সদা প্রফুল্ল মমতাজের প্রতীক, আর কৃষ্ণতাজ হবে চিরবিরহী শাহজাহানের বিষন্নতার প্রতীক। দুয়ের মাঝখানে স্থাপিত হবে সেতু। আশিক-মাশুকের মিলনের প্রতীক। কিন্তু সে ইচ্ছা পূরণ হল না সম্রাটের। শেষ জীবন কাটাতে হলো তাকে বন্দীদশায়, আগ্রার দুর্গ অভ্যন্তরে। ওই বাঁদিকে যমুনার বাকে দেখা যাচ্ছে সেই আগ্রার দুর্গ। ওখানের এক প্রকোষ্ঠে থেকে বিরহকাতর শাহজাহান, বিষন্ন বিমর্ষ উদাস নয়নে তাকিয়ে থাকতেন তাজমহলের দিকে।

চারদিক ঘুরে যতটা সম্ভব দেখে যখন নেমে আসছিলাম, তখন সফরসঙ্গী জনৈক বন্ধু বিরসকণ্ঠে বললেন, এতো এক বুর্জোয়া সম্রাটের বিলাসের প্রতীক। দারুণ অপচয়। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বণ্টন করে দিলে অনেক গরীব ধনী হয়ে যেত। জমিয়ে রাখলেও রাজকোষ হত সমৃদ্ধ। বললাম, প্রলেতারিয়েতদের বন্ধু! সেদিন যেমন, আজও তেমন এ তাজ থেকে সমানে উপকার পেয়ে আসছে প্রেলেতারিয়েতরা। উপকৃত হচ্ছে অন্যরাও। সমৃদ্ধ হচ্ছে রাজভাণ্ডার। তাজদর্শনী অর্থে। সেদিন থেকে এদিন পর্যন্ত এখানে ভিড় জমেছে দেশীবিদেশী দর্শনার্থীদের। কতো উটওয়ালা, কত গাধা খচ্চরওয়ালা, কত ঘোড়া গাড়িওয়ালা, কত শ্রমিক মজদুর এর উসিলায় পাচ্ছে অর্থ। গড়ে উঠেছে কত হোটেল, কত বিপণিবিতান। শতাব্দীকাল ধরে এর উসিলায় ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে। কত সংসারের রাজকোষে জমছে কত দর্শনী অর্থ। এই ধারা যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে, চলতে থাকবে যুগ যুগ ধরে।

প্রত্যাবর্তনের পথে প্রধান ফটকের সামনে চলছে ফটো তোলার পালা। চারদিকে ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দ। সহসা আমাদের দিকে দৌড়ে এলেন এক বিদেশিনী তরুণী। তার হাতের ক্যামেরাটি এগিয়ে দিলেন আমাদের এক সাথীর দিকে। কণ্ঠে আবদার, দিন না তাজকে নিয়ে আমার একটা ছবি তুলে। নিবাস জিজ্ঞাসা করতে বললেন, স্পেন। বললাম, তোমাদেরও তো আছে মুরীয় সভ্যতার অমর নিদর্শন রমণীয় আলহামরা। বললেন, হ্যাঁ, সুন্দর, খুবই সুন্দর। তবে তাজমহল আরো বেশি বেশি সুন্দর। (চলবে)

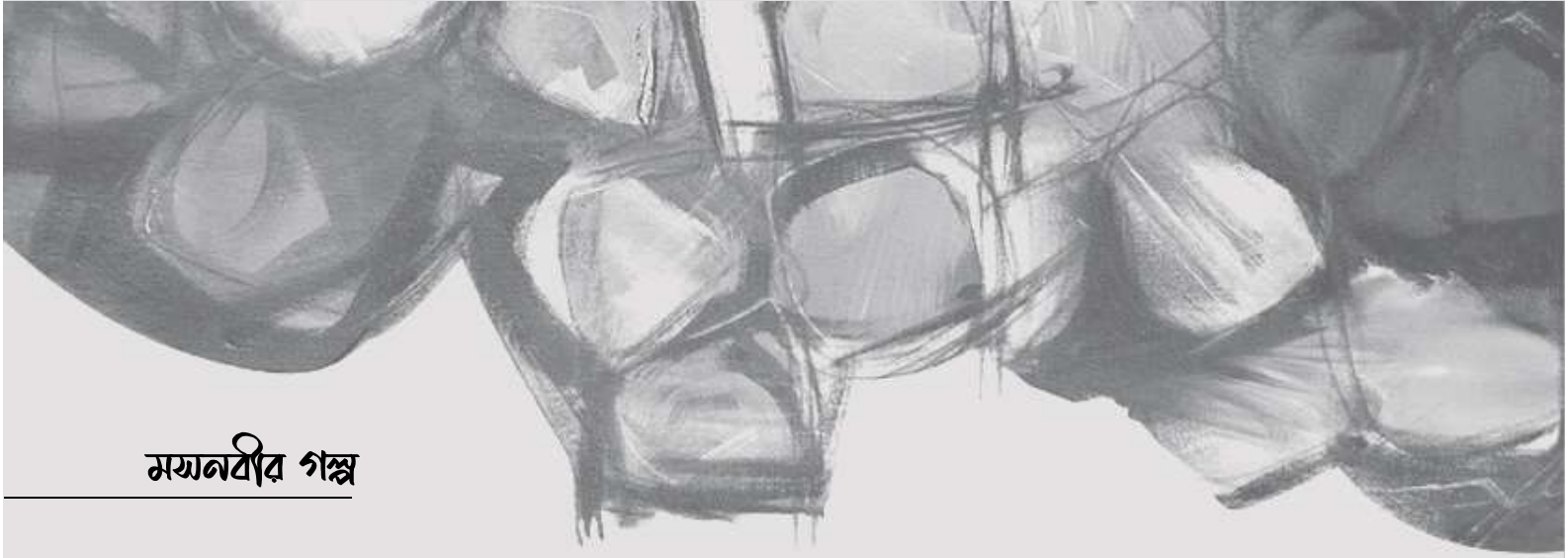

মাওলানা রূমীর মসনবী শরীফ

ধর্মীয় অনৈক্যের বিচিত্র চক্রান্ত জাল

ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

আজ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসারীদের মাঝে বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ আল্লাহর একত্বের উপরে বাড়াবাড়ি করে, নবীজির প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে তাওহীদের পরিপন্থী বলে মনে করে। একদল রাসূলের ভালোবাসার দোহাই দিয়ে নির্দ্বিধায় শরীআতের হুকুম আহকাম পালনের কথা ভুলে যায়। গোঁড়ামী বাড়াবাড়ির কারণে বুঝতে পারে না যে, ইসলামের সব শিক্ষাই সুন্দর।

এক যালিম ইয়াহুদী বাদশাহ খ্রিষ্টান নিধনে কোমর বেঁধেছিল। লক্ষ্য ছিল, খ্রিষ্টান প্রজাদের ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করা। কিন্তু তিনি দমন-পীড়ন যতই বৃদ্ধি করছিলেন, খ্রিষ্টানরা ধর্ম বিশ্বাসে ততই শক্ত ও অবিচল হচ্ছিল। কারণ, দমন-পীড়ন দিয়ে মনের বিশ্বাসকে পরাস্ত করা যায় না। ফল হয় উলটো।

ইয়াহুদী বাদশাহর ছিল এক ধূর্ত ধুরন্ধর উযীর। তখনকার উযীর আজকের দিনের প্রধানমন্ত্রী। উযীর বললেন, জাঁহাপনা! আপনি যেভাবে চেষ্টা করছেন, পারবেন না। কেবল দমন-পীড়ন দিয়ে খ্রিষ্টানদের নিপাত করা যাবে না। আমাকে নিয়ে একটি পরিকল্পনা করুন। দেখবেন, খ্রিষ্টানের বংশ নিপাত হয়ে যাবে। কথামত বাদশাহ উযীরের নাক-কান কেটে দিয়ে বিতাড়িত করেন। উযীর খ্রিষ্টান লোকালয়ে গিয়ে প্রচার করেন, আসলে গোপনে আমি খ্রিষ্টান ছিলাম, তাই আমার এ দশা। ঈসা (আ.) এর অলৌকিক জ্ঞান আমার কাছে আছে। এরপর নানা ছলচাতুরীতে উযীর খ্রিষ্টানদের মধ্যমণি হয়ে যান। তার কথায় খ্রিষ্টানরা উঠে, বসে। এভাবে ছয় বছর কেটে যায়। একদিন হঠাৎ উযীর নির্জনবাসে চলে যান। সবার সাথে দেখা-সাক্ষাত বন্ধ করে দেন। তার দর্শন পাওয়ার জন্য খ্রিষ্টানরা আরো পাগলপারা হয়ে যায়। খ্রিষ্টানরা ছিল বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। তারা সবাই এখন দিশেহারা। বেশ কিছুদিন পর উযীর অনুমতি দিলেন, পৃথকভাবে প্রত্যেক গোত্রের একজন করে লোক দেখা করতে পারবে।

পালাক্রমে তারা উযীরের সাক্ষাত লাভে ধন্য হতে লাগল। উযীর প্রত্যেকের হাতে একটি করে খিলাফতনামা দিয়ে বলেন; আমার পরে তোমাকেই খ্রিষ্টান জগতের

প্রতিনিধি নিযুক্ত করলাম। এই নাও খিলাফতনামা। তবে আমার মৃত্যুর আগে তা প্রকাশ করতে পারবে না। প্রত্যেক গোত্রনেতা বেজায় খুশি। ভাবেন, তিনিই আগামী দিনের খ্রিষ্টান জগতের কর্ণধার। মহামতি উযীরের তিনিই খলীফা। খিলাফতনামার উপদেশগুলোও ছিল দৃশ্যত অতি সুন্দর, তবে ভিন্নভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী ভাব ও বক্তব্যে লেখা।

একটিতে লেখা ছিল-আল্লাহকে পাওয়ার পথ হলো কৃচ্ছতা, ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ, তাওবা ও সর্বক্ষণ আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে থাকা।

در یکی راہ ریاضت را و جوع
رکن توبہ کردہ و شرط رجوع

দার য়্যকী রা'হে রিয়া'যাত রা' ও জূ-
রুক্নে তাওবা কারদে ও শারতে রুজু-
এক পুস্তকে কৃচ্ছতা ও ক্ষুধার যন্ত্রণা তাওবার মূলনীতি
আল্লাহর দিকে রুজু হবার শর্তরূপে নির্ণিত হলো।

আরেকটিতে উযীর লিখে দেন, দান-খয়রাত করাই মুক্তির একমাত্র পথ। কৃচ্ছতা, ক্ষুধার যন্ত্রণা, তাওবা এগুলো তো নিজকে নিয়েই। ব্যস্ততা, স্বার্থপরতা, এগুলো মানুষ নিজের স্বার্থের জন্যই করে।

در یکی گفتہ ریاضت سود نیست
اندریں رہ مخلصی جز جود نیست

দার য়্যকী গোফ্তে রিয়া'যাত সূদ নীস্ত
আন্দারীন রাহ মাখ্লাসী জুয জূদ নীস্ত
আরেকটিতে বলা হয়, কৃচ্ছতায় কোনো লাভ নাই
দান-খয়রাত ছাড়া সাধনার পথে মুক্তির উপায় নাই।

আরেকটি ফর্দে লেখা ছিল-

বান্দা আল্লাহর হাতের ক্রীড়নক। তার নিজস্ব কর্মক্ষমতা নাই। যেমনে নাচাও, তেমনি নাচি। শরীআতে আদেশ-নিষেধ যা এসেছে, তা পালন করার জন্য নয়। আল্লাহর এগুলোর প্রয়োজন নাই; বরং বান্দা যে কত অধম দুর্বল তা প্রকাশ করাই এসব হুকুমের উদ্দেশ্য।

جز توکل جز کہ تسلیم تمام
در غم و راحت ہمہ مکرست و دام

জুয্ তাওয়াক্কুল জুয্ কে তাসলীমে তামা'ম
দার গাম ও রা'হাত হামে মাকরাস্ত ও দা'ম
সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় পুরোপুরি তাওয়াক্কুল বাদে
আল্লাহতে সমর্পিত না হলে সব ধোঁকা ও ফাঁদ হয়ে যাবে।

অপর নির্দেশনায় লিখে দেন-

নিজে কাজ করতে হবে, আল্লাহর হুকুম মত চেষ্টার মাধ্যমে নিজ হাতে নিজের ভাগ্য গড়তে হবে-এটিই সৌভাগ্যের পথ। তাওয়াক্কুলের নামে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা ভ্রান্তি -গোমরাহী।

در یکی گفتہ کہ واجب خدمتست
ور نہ اندیشۂ توکل تھمتست

দার য়্যকী গোফ্তে কে ওয়াজিব খেদ্মাতাস্ত
ওয়ার্না আন্দীশেয় তাওয়াক্কুল তোহমাতাস্ত
আরেকটিতে লিখে, কাজ ও আনুগত্যই আসল ওয়াজিব
আনুগত্য বাদ দিয়ে তাওয়াক্কুল অপবাদের শামিল।

আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ যা এসেছে, তা পালন করার জন্য নয়; বরং বান্দার অক্ষমতা প্রকাশের জন্যেই। কেননা বান্দার পক্ষে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব নয়; একথা যখন উপলব্ধি করবে, তখন আল্লাহর মাহাত্ম্য ও শক্তিমত্তাকে হৃদয়ে অনুভব করতে পারবে।

تا کہ عجز خود ببینیم اندر آن
قدرت حق را بدانیم آن زمان

তা'কে এজ্যে খোদ বেবীনাম আন্দার আ'ন
কুদরাতে হাক্ব রা' বেদানীম আ'ন যামা'ন
আদেশ-নিষেধের আয়নায় যেন নিজ অক্ষমতা দেখতে পাই
তখনই আল্লাহর কুদরত হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পারব সবাই।

উযীরের দেওয়া আরেক খিলাফতনামার মূল বক্তব্য ছিল-

তুমি নিজেকে দুর্বল অধম মনে করো না। তোমার মধ্যে যে শক্তি তা আল্লাহর দান, আল্লাহর দেওয়া নিআমত। কাজেই আল্লাহর উপর সমর্পিত হওয়ার দোহাই দিয়ে নিজের যুক্তিবুদ্ধি ত্যাগ কর না; বরং এই লাইট হাতে নিয়েই সামনে চল।

در یکی گفتہ کہ عجز خود مبین
کفر نعمت کردنست آن عجز ھین

দার য়্যকী গোফ্তে কে এজ্যে খোদ মাবীন
কুফ্রে নে-মাত কারদানাস্ত আ'ন এজ্যে হীন
এক ফর্দে লিখা, নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করো না
অক্ষমতা প্রকাশ মানে আল্লাহর নিআমত অস্বীকার করা।

قدرت خود بین کہ این قدرت ازوست
قدرت تو نعمت او دان کہ ہوست

কুদরাতে খোদ বীন কে ঈন কুদরাত আয উস্ত
কুদরাতে তো নে-মা'তে উ দা'ন কে হুস্ত
নিজের ক্ষমতা দেখ, এই ক্ষমতা তার কাছ থেকেই পাওয়া
তোমার শক্তি-ক্ষমতা আল্লাহর দান, একে অস্বীকার করো না।

আরেক খিলাফতনামার ভাষা ছিল-

যুক্তিতর্ক বাদ দাও। এগুলো সিদ্ধিলাভের অন্তরায়, বাধা। হাতের প্রদীপ নিভিয়ে দাও, লেখাপড়া বাদ দাও, তাহলেই অন্তরের প্রদীপ জ্বলে উঠবে।

در یکی گفتہ کزین دو بر گذر
بت بود ھر چہ بگنجد در نظر

দার য়্যকী গোফতে কেযীন দো বারগোযার
বুত বূওয়াদ হার চে বেগুন্জাদ দার নাযার
অপর ফর্দে লিখে দেয়, ক্ষমতা-অক্ষমতা উভয়কে অতিক্রম করে যাও
কেননা, যা কিছু দৃষ্টির সামনে আসবে সবই মূর্তির সমতুল্য।

নিজকে অক্ষম ক্রীড়নক মনে কর বা আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান মনে কর, উভয় অবস্থাতেই 'আমি'-এর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। যতক্ষণ আমিত্ব বহাল থাকবে এবং ফানার স্তরে না পৌঁছবে, ততক্ষণ সবকিছুই শিরক ও মূর্তিপূজা হিসেবে গণ্য হবে।

در یکی گفتہ مکش این شمع را
کین نظر چون شمع آمد جمع را

দার য়্যকী গোফ্তে মাকুশ ইন শাম-রা'
কীন নাযার্ চোন শাম- আ'মাদ জাম-রা'
এক পুস্তকে লিখে, যুক্তি-তর্কের প্রদীপ নির্বাপিত করো না
কেননা, চিন্তা-দর্শন, যুক্তি-তর্ক সকলের জন্য প্রদীপ।

আরেক খিলাফতনামার বক্তব্য ছিল-
আল্লাহর পথে চলতে গেলে তোমার উস্তাদ দরকার। পীর মুর্শিদ চাই। নচেৎ গোমরাহ হয়ে যাবে। অতীতের জাতিসমূহ ধ্বংস হওয়ার মূল কারণ, তারা আল্লাহর পক্ষ হতে আসা পথ প্রদর্শকদের চিনতে পারেনি, মান্য করেনি।

در یکی گفته که استادی طلب
عاقبت بینی نیابی در حسب
দার য়্যকী গোফতে কে উস্তাদী তলব
আ'ক্বেবাত বীনী নায়া'বী দার হাসাব
এক ফর্দে লিখে যে, তোমার একজন উস্তাদ অবশ্যই দরকার
বংশের দোহাই দিয়ে পরিণামে হতে পারবে না সফলকাম।

এক ফর্দে বলা হয় যে, তোমাকে পীরের অনুগত হতে হবে। নিজের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে চললে জীবনের প্রকৃত ভালোমন্দ চেনার যোগ্যতা তোমার হবে না। শুধু নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলবে না, দেখ তোমার চোখ মাথার অনুগত হয়ে তার সঙ্গেই আছে। এরপরও মাথার সাথে তার আত্মীয়তা নেই। মাথা সে দেখে না, কাজেই নিজ থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে চল। তোমার লক্ষ্য তোমার থেকে দূরে; এমনকি বিপরীত অবস্থানে বলে মনে কর। তাহলেই জীবনের সাফল্য আসবে। নিজে নিজে পরিণামদর্শী হলে চলবে না। অতীতের জাতিসমূহের ধ্বংসের কারণ ছিল, তারা নিজেরাই নিজেদের মাতব্বর হয়েছিল; আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত নবী (আ.) গণকে পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করে নি।

আরেকটির ভাষা ছিল অন্যরকম-
উস্তাদ আবার কে? সব ধোঁকাবাজ-ভন্ড। উস্তাদ পীর মুরশিদ তো তুমি নিজেই। তোমার জীবনের ভালো-মন্দ উন্নতি-অবনতির পথ কোনটি তা নিজেকেই বেছে নিতে হবে।

در یکی گفته که استا هم توی
زانک استا را شناسا هم توی
দার য়্যকী গোফতে কে উস্তা' হাম তোয়ী
যা'ঙ্কে উস্তা'রা' শেনা'সা' হাম তোয়ী
অপর তত্ত্বে লিখে দেয়, উস্তাদ, মুর্শিদ সে তো তুমিই
কারণ, উস্তাদ কে হবে সে সিদ্ধান্ত নাও -তুমিই।

মোটকথা, উযীর এ জাতীয় ভিন্নভিন্ন উপদেশ সম্বলিত ফর্দ লিখে দেয় প্রত্যেক গোত্রের জন্য। সবগুলো উপদেশই সুন্দর, তবে একটা আরেকটার বিরোধী। একটির উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হলে অপরটি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। উযীরের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ গোষ্ঠী ও গোত্রের মাঝে সে বিশেষ ভাবধারা ও নির্দেশনাই প্রচার করতে থাকে। ফল দাঁড়ায়, একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে আল্লাহর উপর অতি নির্ভরশীল তাওয়াক্কুলপন্থী হিসেবে, অপরটি কর্মবাদে বিশ্বাসীরূপে, একটি পীরপন্থী, আরেকটি পীরবাদ বিরোধী। একদল আল্লাহর রহমতের প্রতি অতি আশাবাদী ধর্মকর্ম ত্যাগী। আরেক দল আল্লাহর ভয়ে সদা কাতর কঠোর ধার্মিক। একদল 'দুনিয়া কা মাজা লে লও দুনিয়া তোমারি হায়' মতবাদের অনুসারী। আরেক দল 'দুনিয়া কু লাত মারো দুনিয়া সালাম করে' মতবাদপন্থী রূপে গড়ে ওঠে। বুঝাই যায়, ভালো ভালো শিক্ষা ও উপদেশ নিয়ে বাড়াবাড়ির পরিণামে খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দল উপদলের মাঝে যোজন দূরত্ব তৈরি হয়।

যাইহোক, সবিশেষ গোপনীয়তায় উযীরের দেওয়া খিলাফতের কথা নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ জানতে পারেনি। এভাবে দিন যায় উযীরের প্রতি ভক্ত অনুরাগীদের আগ্রহ-সীমা ছাড়িয়ে যায়। এরইমধ্যে উযীর একদিন নির্জন কুটিরে আত্মহত্যা করেন। উযীরের মৃত্যু সংবাদে শোকের কিয়ামত ঘটে যায় খ্রিষ্টান সমাজে। মহামুনির দাফন কাফনের পর সবাই বসে পরবর্তী ধর্মীয় নেতা নির্বাচনে। প্রত্যেক দলনেতা তখন দাবি করেন, আমিই উযীর হুযুরের একমাত্র খলীফা। যীশূর আশির্বাদ আমারই মাথার মুকুট। আমিই খ্রিষ্টান জগতের প্রধান। এই নাও আমার খিলাফতনামা। দেখতে দেখতে চারদিকে গোলযোগ বেঁধে গেল। প্রত্যেক গোত্র একই দাবি নিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য সংঘাতে লেগে গেল। খুনাখুনি রক্তের নহর বয়ে গেল।

খ্রিষ্টান ধর্মের চরম শত্রু বর্ণচোরা ছদ্মবেশী ইয়াহুদী উযীর খ্রিষ্টধর্মের জন্য পরস্পর বিরোধী যেসব তত্ত্ব দিল তার প্রত্যেকটি তত্ত্বই অতি সুন্দর আর ধর্মীয় উৎকর্ষতা ও আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের সহায়ক। শর্ত হলো, অন্যান্য তত্ত্বের সাথে তার সমন্বয় ও ভারসাম্য থাকতে হবে। যেমন মানব জীবনে তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস ও কর্মসাধনা। নিজের যুক্তিবুদ্ধিকে যেমন কাজে লাগাতে হবে, তেমনি নবী-ওলী মহাপুরুষদের জীবনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু যখন তাওয়াক্কুল, আত্মবিশ্বাস, যুক্তিতর্ক, অন্ধ অনুকরণ প্রভৃতি তত্ত্বকে একমাত্র আদর্শ মনে করা হয় আর অনুসারীরা যখন দাবি করে যে, কেবল আমাদের তত্ত্ব ও মতবাদই ধর্ম, বাকি সব বাতিল, মিথ্যা; তখনই বিপত্তি ঘটে। তখনই ধর্মের মধ্যে মতভেদ, হানাহানির সূত্রপাত হয়, অন্ধের হাতি দেখার অবস্থা হয়। প্রতারক উযীর সে কৌশলই প্রয়োগ করে খ্রিষ্টধর্মে এবং তাতে সফল হয়।

পরিতাপের বিষয়, আজ মুহাম্মদ ﷺ এর অনুসারীদের মাঝে এই বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ আল্লাহর একত্বের উপরে বাড়াবাড়ি করে, নবীজির প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে তাওহীদের পরিপন্থী বলে মনে করে। একদল রাসূলের ভালোবাসার দোহাই দিয়ে নির্দ্বিধায় শরীআতের হুকুম আহকাম পালনের কথা ভুলে যায়। এ কথা সবার চিন্তায় থাকা উচিৎ যে, কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্যের একমাত্র অনুসারী নয়।

মসনবীর এ গল্প ও মাওলানা রূমী (র.) এর উপদেশমালা আজকের সমাজকে পথ দেখাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

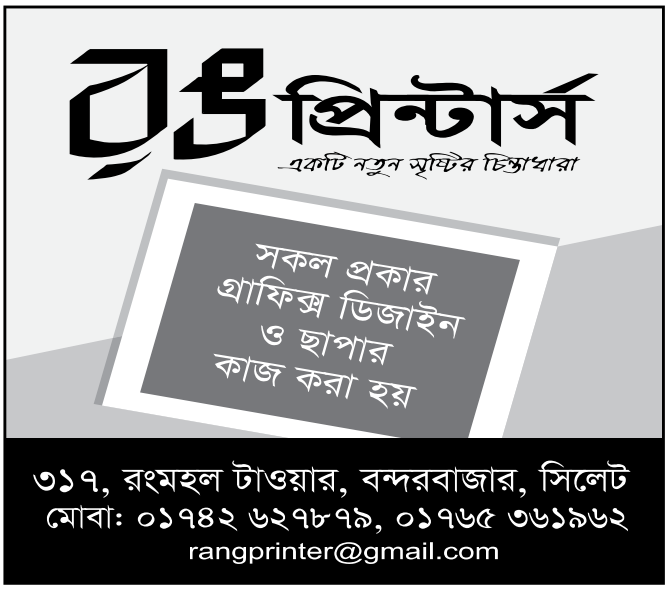

ফুতুহুল গাইব

মূলঃ গাউসুল আযম মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদির জিলানী (র.)

অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ যোবায়ের

[আল্লাহপ্রাপ্তির উপায়, পার্থিব জীবনের হাকীকত, শরীআত অনুযায়ী জীবনযাপনের গুরুত্ব, আল্লাহর ফয়সালায় আত্মসমর্পন করা, তাওয়াক্কুল, খাউফ, রিদার মর্মার্থ, নফস ও প্রবৃত্তির মুকাবিলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর ৮০টি বক্তব্যের এক অনবদ্য সংকলন ফুতুহুল গাইব। শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর একজন মুরীদ শাইখ যাইনুদ্দীন মারসফী আস সাইয়াদ এ গ্রন্থটির মূল সংকলক। শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ মক্কায় হজ্জ করতে গিয়ে শাইখ আলী মুত্তাকীর কাছে বইটি পেয়ে একটি কপি সাথে করে নিয়ে আসেন। উপমহাদেশে তখন থেকেই অত্যন্ত উপকারী এ গ্রন্থটি বিপুল জনপ্রিয়। হিন্দুস্তানে কাদিরিয়া তরীকার বিশিষ্ট বুযুর্গ শাহ আবুল মাআলী আল কাদিরীর (মৃ. ১০২৪ হি.) নির্দেশক্রমে শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী ফুতুহুল গাইবের ব্যাখ্যা এবং মিশকাতুল মাসাবীহের ব্যাখ্যা (আশআতুল লুমআত) রচনা করেন। আমরা ফুতুহুল গাইবের অনুবাদের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় স্থানে সংক্ষিপ্তভাবে শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভীর ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি।- অনুবাদক]

(দ্বিতীয় পর্ব)

পরিচ্ছেদ- ৩ (বালা-মুসিবতে বান্দার উত্তরোত্তর উন্নতি প্রসঙ্গে)

সাধারণ মানুষের স্বভাব হলো বান্দা কোনো বালা-মুসিবতের পরীক্ষায় পড়লে (সেটা থেকে মুক্তি পেতে) প্রথমেই নিজে নিজে চেষ্টা করে। এরপরও যদি মুক্তি না মিলে, তাহলে অন্য কারও সহায়তা নেয়। যেমন রাজা-বাদশা, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, দুনিয়াদার, সম্পদশালী এবং রোগ-যন্ত্রণার ক্ষেত্রে চিকিৎসক ব্যক্তিবর্গ। এরপরও যদি মুক্তি না মিলে তাহলে প্রার্থনা, কাকুতিমিনতি আর প্রশংসা করার মাধ্যমে তার প্রতিপালকের দিকে ফিরে আসে।[১]

(মানুষের অবস্থা হলো) যতক্ষণ নিজ থেকে (মুক্তি পেতে) সাহায্য পায়, অন্য মানুষের দ্বারস্থ হয় না। আবার যতক্ষণ অন্যদের কাছ থেকে সহায়তা পায়, স্রষ্টার দ্বারস্থ হয় না।[২]

এরপর আল্লাহর কাছ থেকেও যদি সাহায্য না পায়,[৩] তাহলে তাঁর দরবারে নিজেকে ছুঁড়ে ফেলবে, তাঁর প্রতি যুগপৎ ভয় আর আশা নিয়ে অনবরত যাঞ্চা আর দুআ করতে থাকবে; কাকুতিমিনতি আর তাঁর স্তুতি করতে থাকবে, (তাঁর প্রতি নিজের) মুখাপেক্ষিতা তুলে ধরবে। কিন্তু আল্লাহ এরপর তাকে দুআ করতেও অক্ষম করে দেন, তার ডাকে সাড়া দেন না। অবশেষে সে (মুসিবত থেকে মুক্তির) যাবতীয় উপকরণ (আসবাব) থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন তার উপর ভাগ্য কার্যকর হয়, জারি হয় (আল্লাহর) কর্মধারা। বান্দা তখন তার যাবতীয় উপকরণ আর প্রচেষ্টা থেকে ফানা হয়ে যায়[৪]- সে অবশিষ্ট থাকে কেবল রুহ হিসেবে।[৫]

এখন সে যেহেতু মহান আল্লাহর কর্ম ছাড়া আর কিছুই দেখে না, তাই সে আবশ্যকীয়ভাবে, নিশ্চিতভাবে একত্ববাদী হয়ে যায়। সে নিশ্চিতভাবে জেনে নেয় যে, বাস্তবিক অর্থে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কর্তা নেই, আল্লাহ ছাড়া কোনো স্থিরকারী বা সঞ্চালনকারী নেই; সকল ভালো-মন্দ, উপকার-ক্ষতি, দান-বঞ্চনা, উন্মোচন-আবদ্ধকরণ, জীবন-মৃত্যু, সম্মান-লাঞ্ছনা, দরিদ্রতা-ধনাঢ্যতা সবই আল্লাহর অধীন। সে তখন তাকদীরের মধ্যে দুধমার কোলে দুগ্ধপোষ্য শিশু, গোসলদাতার হাতে মরদেহ আর ঘোড়সওয়ার পোলো[৬] খেলোয়াড়ের লাঠির সামনে বলের মতো হয়ে যায়, যাকে কেবলই ঘোরানো-ফেরানো হয়, পরিবর্তন করানো হয়, পরিবর্ধন করানো হয়, বানানো হয়; আর সেই (বল) নিজ থেকে যেমন নড়তে পারে না, তেমনি অন্য কিছুকেও নাড়াতে পারে না।

ব্যক্তি তখন তার মাওলার কর্মধারায় মগ্ন হয়ে আত্মবিস্মৃত হয়। তাই মাওলা আর তার কর্মধারা ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ে না।[৭] কেবল তাঁর কাছ থেকেই সে শোনে, কেবল তাঁর কাছ থেকেই উপলব্ধি করে। সে কিছু শুনলে আর জানলে, কেবল আল্লাহর কালাম শোনে, তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে জানে, তাঁর নিয়ামতে প্রাচুর্যমণ্ডিত হয়, তাঁর নৈকট্যে সৌভাগ্যবান হয়, তাঁর নৈকট্যদানের মাধ্যমে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়, সম্মানিত হয়, তাঁর ওয়াদায় সে আনন্দিত আর নিশ্চিন্ত হয়। তাঁকে নিয়েই সে প্রশান্তি লাভ করে, তাঁর কথায় সে অন্তরঙ্গ হয় আর অন্যদের থেকে দূরে সরে যায়, পালিয়ে যায়। তাঁর যিকরে আশ্রয় নেয়, যিকরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মহান আল্লাহর উপরই সে আস্থা রাখে, তাঁর উপর নির্ভর করে, তাঁর মারেফাতের নূরে সে যেমন সুপথপ্রাপ্ত হয়, তেমনি এতেই আবৃত হয় জামা আর তহবন্দের মতো।[৮] আল্লাহ তায়ালার অনেক দুর্লভ জ্ঞান সে অবগত হয়, তাঁর কুদরতের অনেক রহস্য জানতে পারে। মহান আল্লাহর কাছ থেকেই সে শোনে এবং মনে রাখে। এরপর এসবের জন্য তাঁর প্রশংসা-গুণকীর্তন করে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, তাঁর কাছে প্রার্থনা করে।[৯] (চলবে)

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কাছে অত্যন্ত কাকুতিমিনতি সহ দুআ করে। একইসাথে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে। শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা আর গুণকীর্তন করাও ইশারায় যাঞ্চা করার সমতুল্য।

২. শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন, শাইখ এখানে মানুষের মূর্খতা আর অজ্ঞতার দিকে ইশারা করেছেন। মানুষের যদি সত্যিই ইলমে মারিফাত থাকতো, তাহলে প্রথমেই অন্য সবকিছু ছেড়ে আল্লাহর দ্বারস্থ হতো।

৩. শাহ সাহেব বলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে দ্বারস্থ হতে বিলম্ব করার দরুন শাস্তি হিসেবে আল্লাহ সাহায্য করেন না। অথবা ব্যক্তির কোনো কল্যাণের জন্যই সাহায্য হতে পারে, এমন সব উপকরণ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেনা।

৪. অথবা তাকে ফানা করে দেওয়া হয়। যখন যাবতীয় উপকরণ বিচ্ছিন্ন হয়, তখন ইনকিতা ইলাল্লাহ বা সবকিছু থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহর অভিমুখিতা অর্জিত হয়।

৫. শাহ সাহেব এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ ব্যক্তির ভিতর থেকে তখন মানবীয় গুণাবলি যেমন প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি দূর হয়ে রুহানী গুণাবলি চলে আসে। যেমন পানাহার, নিদ্রা ও অন্যান্য শারীরিক কর্মবৃত্তি থাকে না। তার স্থিতি থাকে সার্বক্ষণিক আল্লাহর যিকরের সাথে। অনুভূতি থেকে উনস (অন্তরঙ্গতা), সুকুন (প্রশান্তি) ইত্যাদি মানবীয় ও শারীরিক গুণ অন্তর্হিত হয়ে সে জায়গায় এর বিপরীত রুহানী ও ফিরিশতাসুলভ গুণ জায়গা করে নেয়। বান্দাহ তখন রুহসমূহ আর ফিরিশতাদের সাক্ষাত লাভ করে।

৬. পোলো পৃথিবীর প্রাচীনতম খেলার একটি। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এটি খেলতে হয়। খেলার অনুষঙ্গ হিসেবে হকি খেলার হকিস্টিক ও বলের উপস্থিতি থাকে। প্রাচীন পারস্যে উদ্ভাবিত এই খেলা রাজা-বাদশার খেলা হিসেবে সুপরিচিত।

৭. শাহ সাহেব বলেন, 'এটা তাওহীদে আফআলি। বেশিরভাগ দৃঢ়পদ সূফী শাইখ এই তাওহীদ ছাড়া অন্য কোনো যে তাওহীদের দিকে ইশারা করেননি। যার উপর তাওহীদ প্রবল হয়ে ওঠে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার কাছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব থাকে না।' অর্থাৎ অধিকাংশ সূফী শাইখ ওয়াহদাতুশ শুহুদের কথা বলেছেন, ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের কথা নয়।

৮. শাহ সাহেব বলেন, এর অর্থ মারিফাতের নূর যখন চমকাতে থাকে, তখন বান্দার ইবাদত আর অভ্যাসগত কাজ-সবকিছুই আল্লাহ তাআলার অনুমতি ও আদেশে হয়ে থাকে।

৯. এদিকে ইশারা করা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নিআমত, কল্যাণ আর শুভপরিণাম দানের জন্য তাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত বান্দাহর শুকরিয়া আর দুআ করেই যেতে হয়।

খাতুন

ছাত্রী জীবনে শালীনতা প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

অধ্যাপিকা হাফিজা খাতুন

আজ থেকে চার পাঁচ দশক আগেও বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে মেয়েদের তেমন উশৃঙ্খল পদচারণা দেখা যায়নি। তখন প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা ছিল সংখ্যালঘু। দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের আগমনের ব্যাপকতা লাভ করে স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশের পর থেকে। বর্তমান শতাব্দীর শেষ দশকে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরা প্রায় সমসংখ্যায় এসে দাঁড়িয়েছে। আর সেই সাথে আধুনিকতাও আরো প্রসার লাভ করছে। যাকে এখন আর আধুনিকতা বলা যায়না, বলা যায় নগ্ন হওয়ার প্রতিযোগিতা।

কয়েক দশক পূর্বেও শহরের ছাত্রীদের মাঝে বিশেষ করে মুসলিম পরিবারে মেয়েদের ইসলামী অনুশাসনের বলয়ে চলতে দেখা গেছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী ও পুরুষকে পৃথকভাবে চলাফেরা করতে দেখা গেছে। এ সময় শালীনতা একটা মুখ্য বিষয় ছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় পঞ্চাশ ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে কোনো মেয়ের সাথে কোনো ছেলেকে কথা বলতে দেখলে, ছেলেকে জরিমানা করা হতো। এমনকি কোনো মেধাবী ছেলেকে বিদেশে স্কলারশীপ দেওয়ার আগে খতিয়ে দেখা হতো তার ব্যক্তি স্বভাব-চরিত্রকে। অনেক মেধাবী ছেলের এমনও হয়েছে যে একটি মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব ও কাছাকাছি সম্পর্ক থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে বিদেশে স্কলারশীপ দেননি। অথচ আজ এসব কাল্পনিক গল্প মনে হবে পাঠকদের কাছে। আমাদের এই প্রজন্মে কতটা পরিবর্তন হয়েছে তা এই সব ঘটনা থেকে তুলনা করে অতি সহজে অনুমান করা যায়। সে সময় মেয়েদেরকে ছেলেদের মিছিল মিটিং এ দেখা গেছে বলে শোনা যায়নি। আর আজ মেয়েরাই মিছিলের সর্বাগ্রে থাকে। মনে হয় তারা নেতৃত্ব দিচ্ছে, আর ছেলেরা তাদের অনুসরণ করছে।

একথা সত্য, বাংলাদেশের সময় বদলেছে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত। বিশ্ব আজ এগিয়ে যাচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞান আধুনিকতায়। আর সেই সাথে ধীরে ধীরে ছিটকে পড়ছে ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধি নিষেধের বলয় থেকে। এর প্রধান কারণ হলো ধর্মকে গভীর ও সঠিকভাবে অনুসরণ না করা। ইসলাম ধর্ম পথে না চলে মানব রচিত বিধানের পথে চলা।

এই শতকের শুরুতে রাশিয়া সমাজতন্ত্র কায়িম করে ধীরে ধীরে প্রায় দুই ডজন দেশকে তার তন্ত্রের আয়ত্বে এনে বিশৃঙ্খল ও বিভক্তির সৃষ্টি করে। পাশাপাশি চলতি শতকের শেষ দিকে বিশ্বে আবার জোয়ার আসে তথাকথিত মানব রচিত গণতান্ত্রিক ধারার। এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এই জোয়ারে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয় এবং বিনিময়ে তারা পায় তথাকথিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারা। আর এর নাম দেয় আধুনিকতা। ফলে নারীদের কাছে এই আধুনিকতাটি নগ্নতায় রূপ নেয়। তখনই শুরু হয় নগ্নতার প্রতিযোগিতা। শিক্ষাঙ্গনেই প্রথম এর প্রভাব জীবাণুর মত ছড়িয়ে পড়ে।

এতে ছাত্রীরা হারায় তাদের শালীনতা। বোরখা হারিয়ে যায় একসময়। তারপর আসে মাথায় বড় ওড়না। সেটাও সময়ের তালে পড়ে যায়। পোশাক ক্রমে ক্রমে কমতে থাকে। এখন মেয়েদের শরীরের এক বৃহৎ খোলা অংশে সূর্যের আলো পড়ে। ছেলেদের পাশাপাশি বসে গল্পগুজব চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

ঢাকা শহরের পার্কগুলোকে এখন আর পার্ক বলা যায়না। এগুলো পরিণত হয়েছে প্রেম নিকুঞ্জে। কপোত কপোতিদের দিনরজনীর আড্ডাখানা। স্কুলের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত ক্লাস ফাঁকি দিয়ে এখানে সময় কাটিয়ে যায়। আর তাদের সাথে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা তো আছেই। সহজ সরল ধর্মপরায়ণ পথচারীদের এখন নির্বিঘ্নে এসব পার্কের পাশ দিয়ে পথচলা রীতিমত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পথচারীরা পথ চলতে হঠাৎ চোখ ফেলছে তাদের উপর। দেখা যাচ্ছে বেপরোয়াভাবে তারা গায়ে গা ঘেঁষে বসে বসে গল্প করছে, হাসছে, বাদাম চিবোচ্ছে; সে এক অশালীন বেহায়াপনার স্বপ্নকান্ড মনে হবে পথচারীর কাছে। এটা একদিক দিয়ে যেমন বিরক্তিকর অন্যদিক থেকে তেমনি লজ্জাকরও বটে।

দেশে প্রায় ডজনেরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালে ছাত্রীদের আসল রূপ চরিত্র বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়না। ঐতিহ্যবাহী নামধারী প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এখন ছেলেমেয়েদের দীর্ঘ সময়ের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। যা এক সময় ছিল কল্পনাতীত। বৃহৎ দুটি ছাত্রী নিবাসে (শামসুন্নাহার হল ও রোকেয়া হল) মেয়েদের একটি বড় অংশ অবস্থান করছে। একসময় তাদের সন্ধ্যার পরপরই হলের ভিতর ঢুকতে হতো। কিন্তু বর্তমানে রাত ৯টা পর্যন্ত তাদের হলের বাইরে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩ এর সূর্যাস্ত আইন বাতিলের দাবিতে মেয়েরা মিছিল মিটিং করে সে আইনকে শিথিল করে এটা করেছে। যুক্তি দেখিয়েছে মেয়েদের লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়ার কথা, বাইরে নানা ধরনের কর্মব্যস্ততার কথা। কিন্তু তার সত্যতা অনেকখানিই অমূলক। অথচ সন্ধ্যার পর ৩০/৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীর বেশি লাইব্রেরিতে অবস্থান করছেনা।

অপরদিকে মেয়েদের হলগেটদ্বয়ের সামনে থেকে শুরু করে ডাস, অডিটোরিয়াম এবং চত্বরে রাত দশটা পর্যন্ত শতশত ছেলেমেয়েদের ভীড় লেগে থাকছে। রাত একটু বাড়লেই দেখা যায় হল সংলগ্ন রাস্তার পাশে অন্ধকারে জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েরা গায়ে গা ঘেঁষে বসে আছে। একে অপরের

প্রতি বেপরোয়া আচরণ করছে। সাধারণ ভদ্রলোকের পক্ষে তখন রাস্তা দিয়ে রিকশায় কিংবা হেঁটে চলা রীতিমত লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও একই অবস্থা। মতিহার চত্বর যেন এক প্রমোদ আর আড্ডা চত্বরে পরিণত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বৃহৎ অংশ মেতে আছে এই আড্ডায়, ছাত্রীদের পোশাকে চালচলনে তারা যেমন নগ্ন, তাদের পদচারণাও তেমনি আধুনিক।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত কুষ্টিয়ার এ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে নামেমাত্র ইসলামী ফ্যাকালটি রয়েছে, এর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র কয়েক হাজার, আর বাকী সব অন্যান্য বিষয়ের ছাত্র। নামেমাত্র ইসলামী কয়েকটি বিষয় পড়ানো হচ্ছে এখানে। ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থা অনেকটা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো। শরীআহ ফ্যাকালটিতে মেয়েদের মধ্যে কিছুটা শালীনতাসুলভ পোশাক থাকলেও অন্যান্য ফ্যাকালটির অবস্থা অত্যন্ত করুণ। যা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে একান্ত কাম্য নয়।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে ছেলে ও মেয়েদের পাশাপাশি এবং একই বেঞ্চের এই শিক্ষা ব্যবস্থাটি যতটা না প্রভাব বিস্তার করছে তার চেয়ে বেশি বিস্তার করছে আধুনিকতার নামে অপসংস্কৃতি আর নগ্নতার জোয়ার। এদেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়েগুলো বাইরের পরিবেশে মিশে তাদের নৈতিক সুন্দরতম চরিত্রটাকে হারাচ্ছে। ইসলামী আইন অনুশাসন থেকে তারা দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষায় পা দিয়ে তারা নিজেদেরকেই নিজেদের যোগ্য অভিভাবক মনে করছে। কোনো উপদেশ আর পিতামাতা বা বড়দের অভিভাবকত্ব তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছেনা।

বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত। আমাদের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। দেশের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি জনসংখ্যা মুসলমান। অথচ তারপরেও বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনা করলে দেখা যায়, আমরা কতটা নীচে নেমে গেছি। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশে আজ মেয়েদের যে অবস্থা বিরাজ করছে আমাদের মধ্যে তাও নেই। আর অন্যান্য ইসলামী দেশগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম।

যে দেশে ইসলামকে ঘটাকরে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়। ইসলামের নামে রাষ্ট্রের বড় বড় দলগুলোর নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা বিবৃতি দেন, সেদেশে মেয়েদের নৈতিকতা, পর্দাশীলতা কিভাবে এতটা অবনতির দিকে দিন দিন ধাবিত হচ্ছে তা অতি সহজেই অনুমেয়। মূলতঃ আমাদের দেশে ইসলামের নাম করে কিছু ধ্বজাধারী মুখোশ পরিধানকারী লোক রয়েছে তারা এটাকে পরোক্ষভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা যুগিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া একশ্রেণির তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহল রয়েছে তারা মৌলবাদ মৌলবাদ বলে ইসলামের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছে। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের সমালোচনা করছে। ইসলাম আধুনিকতার অন্তরায়, তারা ইসলাম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে বাধা সৃষ্টি করছে। তারা বলছে ইসলাম নারীদের সঠিক মূল্যায়ন করেনি, এ যুগে ইসলাম আকার্যকর। ইত্যাদি নানা ধরনের কথা তারা বলছে। এতে উৎসাহ পাচ্ছে এ প্রজন্মের নারীরা এবং শিক্ষাঙ্গনের ছাত্রীরা। এ কারণে আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলো আজ এতো নগ্নতা বেহায়াপনা আর অশালীনতায় ভরে যাচ্ছে। এর প্রভাবে সুন্দর গোলাপের মত ছেলেরা তাদের নৈতিকতাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হচ্ছে। তারা ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। নারী তাদের কাছে পড়াশোনার পাশাপাশি একটা আলোচনার অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যাম্পাসে, করিডোরে, আবাসিক হলে নারী নিয়ে আলোচনা একটি অন্যতম বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

এ অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলোর অবস্থা আরো অবনতির দিকে যাবে। পাশ্চাত্যের দেশগুলোর মতো অবস্থা বিরাজ করবে। ফলে নানা ধরণের অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হবে। নতুন নতুন জটিল রোগের আবির্ভাব ঘটবে। ইসলামী অনুশাসন আর পর্দা ও শালীনতার কোনো নিয়ম থাকবেনা। আমাদের পারিবারিক জীবনে নেমে আসবে চরম বিশৃঙ্খলা। আমরা হবো মুসলিম নামধারী অশালীন অনৈতিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ এক ধর্মচ্যুত পথভ্রষ্ট পতিত জাতি।

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা

জীবন জিজ্ঞাসা বিভাগে

“ঈমান, আমাল ও আকীদা বিষয়ক আপনার যেকোনো প্রশ্ন আজই পরওয়ানার অনুকূলে পাঠিয়ে দিন। ???

প্রশ্ন করুন

প্রশ্ন করার নিয়ম
- শুধুমাত্র প্রশ্নের মূল কথাগুলো লিখে পাঠাতে হবে
- ই-মেইল অথবা ডাকযোগে প্রশ্ন পাঠাতে পারবেন

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা

অফিস: বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট বিভাগীয় অফিস: পরওয়ানা ভবন-৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট
E-mail: parwanabd@gmail.com

- পোস্টার
- লিফলেট
- ক্যালেন্ডার
- প্রসফেক্টাস
- বই/ম্যাগাজিন
- প্যাড/মেমো
- মগ/ক্রেস্ট

সৃজনশীল ডিজাইন,
নিখুঁত ছাঁপা ও নির্ভরযোগ্য
প্রকাশনায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নাম

প্রিন্টেক্স পারফেকশন

১৪ প্যারিস ম্যানশন
জিন্দাবাজার, সিলেট।
মোবা: ০১৭২৬ ৫৬২০২৬
০১৬১২ ১৪৭৪৯৬

pcsyl80@gmail.com
printexcomputer

এই মাসে এই চাঁদে

মুহাম্মদ নিবরাস উল্লাহ

আজারবাইজান মুসলিম অধিকারে আসে

এক সময় পৌত্তলিকতার প্রধান কেন্দ্র ছিল আজারবাইজান। প্রাচীনকালে এখানে অগ্নি উপাসকদের নির্মিত বহু অগ্নিকুন্ড ছিল বলে জানা যায়। এর নামকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও দেখা যায় যে, পৌত্তলিকতার সাথে নামটি অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। পাহলবী অভিধানে আজার অর্থ আগুন এবং বাইগান মানে রক্ষক অর্থাৎ অগ্নিরক্ষক। এই দুটি শব্দের মিলিত রূপ হচ্ছে আজারবাইগান বা আজারবাইজান। সেখানে একটি অগ্নিকুন্ড নির্মাণ করা হয়েছিল, যার নাম হয় আজার আবাদগান- যা পরবর্তীকালে আজারবাইজানে পরিণত হয়। এই এলাকায় অগ্নিকুন্ডের আধিক্যের দরুন এলাকাটির নাম আজারবাইজান হয় বলে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা হতে জানা যায়। আরবরা তাদের ভাষায় এর নামকরণ করেন আজারবাইজান।

ফারুকী খিলাফত আমলে আজারবাইজানে মুসলিম অভিযান ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এলাকাটি কার হাতে বিজিত হয় সে সম্পর্কে মতবিরোধ থাকলেও এটি সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে হযরত হুযাইফা ইবন ইয়ামান (রা.) এর হাতে বিজিত হয় বলে বিখ্যাত ঐতিহাসিক আহমদ ইবন ইয়াহইয়া বালাজুরী (২৭৯/৮৯২) তার 'ফুতুহুল বুলদান' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে অন্যান্য বর্ণনা হতে জানা যায় যে, হযরত উমর (রা.) কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত উতবা ইবন ফারকাদ (রা.) আজারবাইজান জয় করার জন্য অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানটি দুই ভাগে ভাগ করত: একটি অভিযানের নেতৃত্ব দান করেন স্বয়ং উতবা ইবন ফারকাদ এবং অভিযানের অপর অংশের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত বুকাইর ইবন আবদুল্লাহ (রা.)। আজারবাইজানের শাসনকর্তা ছিলেন ইস্কান্দিয়ার। একটি পার্বত্য এলাকায় ইস্কান্দিয়ারের সাথে হযরত বুকাইর (রা.) এর মোকাবিলা হয়। যুদ্ধে ইস্কান্দিয়ার পরাজিত হয়ে গ্রেফতার হন। অপরদিকে হযরত উতবা (রা.) তাঁর লক্ষ্যস্থল জয় করেন। ইস্কান্দিয়ারের ভাই বাহরাম উতবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও তিনিও পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। ইস্কান্দিয়ার তার ভ্রাতার পরাজিত হওয়ার খবর শ্রবণ করার পর হযরত বুকাইর (রা.) কে বললেন, যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে, আমি জিযিয়া বা কর দিয়ে সন্ধি করতে চাই। যেহেতু আজারবাইজান এই দুই ভ্রাতার অধিকারে ছিল, সেহেতু ইস্কান্দিয়ারকে এই শর্তে মুক্তি দেওয়া হয় যে, তিনি আজারবাইজানের শাসক হিসেবে কর দিতে থাকবেন। এভাবে আজারবাইজান সন্ধির মাধ্যমে মুসলিম অধিকারে এসে যায়।

ঐতিহাসিক বালাজুরী বলেন, আজারবাইজানের পতাকা হযরত হুযাইফা ইবন ইয়ামান (রা.) কে প্রদান করা হয়েছিল। তিনি নেহাবন্দ হতে যাত্রা করে আজারবাইজানের রাজধানী আর্দেবিলে পৌঁছেন। সেখানকার শাসনকর্তা কয়েকটি এলাকা থেকে এক বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করে হযরত হুযাইফা (রা.) এর মুকাবিলা করেন এবং পরাজিত হন। অতঃপর বার্ষিক এক লাখ মুদ্রা কর হিসেবে প্রদানের শর্তে সন্ধি করেন। এরপর হুযাইফা (রা.) মুকান, ও জিলানী এলাকায় আক্রমণ চালান এবং ঐসব এলাকা জয় করত সেখানে বিজয় পতাকা উত্তোলন করেন। ইতোমধ্যে খিলাফতের দরবার হতে হযরত হুযাইফা (রা.) এর বরখাস্তের ফরমান আসে এবং উতবা ইবন ফারকাদ (রা.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। উতবা (রা.) তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছার আগেই আজারবাইজানের সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। সুতরাং হযরত উতবা (রা.) ঐসব এলাকা পুনরায় জয় করেন।

পৌত্তলিকতার প্রধান কেন্দ্র আজারবাইজান হিজরী ২২/৬৪২ সালের ৩ ডিসেম্বর মুসলমানদের অধিকারে আসার পর সেখানে ইসলামের আলো বিস্তার লাভ করে।

ইমাম গাযালী (র.) ইন্তিকাল করেন

ইসলামী ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা চরিত্র গুরু নামে খ্যাত হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আবূ হামিদ আল গাযালী ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে খোরাসানের তুস নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তুস, জুর্জান এবং নিশাপুরে শিক্ষা লাভ করেন এবং খুব দ্রুত জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে বিরাজ করতে থাকেন। প্রথমে তিনি বাগদাদে নিযামুল মুলকের প্রতিষ্ঠিত নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। চার বছর পর সেখান থেকে আলাদা হয়ে সাধনা আরম্ভ করেন। শেষ বয়সে তিনি সুলতান মালিক শাহের অনুরোধে নিশাপুরের মাদরাসায় অধ্যাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত হন। তাঁর রচনাবলির সংখ্যা দুই শতাধিক। কারো কারো মতে, ৭৯ বলে জানা যায়। তাঁর রচনাবলির মধ্যে 'কিমিয়ায়ে সাআদাত' ও 'ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন' বিশ্ববিখ্যাত।

ইমাম গাযালী (র.) এর ইন্তিকালের ঘটনা তাঁর ভাই আহমদ গাযালীর বর্ণনানুযায়ী সোমবার ভোরে ইমাম সাহেব ঘুম থেকে উঠে উযূ করার পর নামায আদায় করেন। অতঃপর কাফনের কাপড় তলব করেন এবং চোখে সুরমা ব্যবহার করত: বলেন, 'রবের নির্দেশ শিরোধার্য' একথা বলে তিনি পা প্রসারিত করে দেন। লোকেরা দেখল যে, তিনি ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর ইন্তিকালে সমগ্র মুসলিম দুনিয়া দারুণভাবে শোকাবিভূত হয়ে পড়ে। বহু কবি শোকগাঁথা রচনা করেন।

ইমাম গাযালী (র.) এর মৃত্যু ছিল যেন সেই যুগের গবেষণা-ইজতিহাদ, দ্বীনের সংস্কার, ইসলামী চিন্তা-চেতনার পুনর্জীবন, সত্যচিন্তা ও সত্য বলা এবং মারিফতের রহস্যাবলি ও তাসাওউফের মৃত্যু। তিনি শরীআতের সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়াবলি এবং তাসাওউফ ও নৈতিকতায় যে মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন তাঁর কোনো তুলনা হয় না। ইমাম সাহেব ইসলামের নানা বিষয়ে অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন। চরিত্র গঠনে মৌলিক উপাদান হিসেবে তাঁর রচিত ইহইয়াউ উলূম, কিমিয়ায়ে সাআদাত, মারিফাত-তাসাওউফে মিনহাজুল আবিদীন ও মিরাজুস সালিকীন প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইসলাম ও মুসলমানদের দরদী খাদিম হযরত ইমাম গাযালী (র.) তাঁর অনন্য সাধারণ অবদানের জন্য স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর ইন্তিকালের তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। একটি মত অনুযায়ী, হিজরী ৫০৫/১১১১ সালের ১৮ ডিসেম্বর তিনি ইন্তিকাল করেন। বাগদাদে তাঁর মাযার অবস্থিত।

কারামাতা সন্ত্রাসীরা বাইতুল্লাহ শরীফে হত্যাযজ্ঞ চালায়

'কারামাতা' নামে পরিচিত ভ্রান্ত সন্ত্রাসবাদী দলের বহু ধ্বংসাত্মক তৎপরতার কাহিনী ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়। খলীফা মুতামিদসহ পরবর্তী কয়েকজন খলীফার আমল পর্যন্ত কারামাতা সন্ত্রাস মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়; অনেক চেষ্টার পরও তা দমন করা সম্ভব হয়নি এবং তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ১৭তম খলীফা মুকতাফীর আমলে কেবল ইরাক নয় আরও অনেক স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এমনকি বাহরাইনেও তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী খলীফা মুকতাদির এর আমলে কারামাতা প্রধান আবু সাঈদ জুন্নাবী বাহরাইনের শহরগুলো অধিকার করার পর নিহত হলে তার পুত্র আবূ তাহির তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়। সে বসরায় প্রবেশ করে। সে দুই সপ্তাহ ধরে বহু লোককে হত্যা করে এবং তাদের মালমাত্তা ও নারী-শিশুদের ধরে নিয়ে যায়। অতঃপর সে হাজীদের কাফেলা লুট করতে থাকে। বাগদাদের খিলাফত প্রশাসন তাদের দমন করার জন্য বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করে ব্যর্থ হয়, এমনকি বাগদাদ ও কুফায় তাদের আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিলে জনগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। হিজরী ৩১৫ সালে খলীফা মুক্তাদির ইউসুফ ইবন আবী মাঞ্জাকে সৈন্যসহ আবূ তাহিরকে দমন করার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে কারামাতারা জয়ী হয়, ইউসুফ বন্দী হন এবং তার বাহিনীর অধিকাংশকে হত্যা করা হয়। এভাবে সিরিয়া আক্রমণ করে এবং হত্যাকাণ্ড ও লুটপাট চালায়। এভাবে তারা ইরাকসহ নানা স্থানে যে অরাজকতা চালায়, তা বর্ণনাতীত। অতঃপর তারা পবিত্র মক্কায় তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ সম্প্রসারিত করে এবং সেখানে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। হিজরী ৩১৭ সালের ৮ যিলহজ্জ তারিখে আবূ তাহির কারামতী বাইতুল্লাহ শরীফ ও মসজিদে হারামে প্রবেশ করে অসংখ্য হাজী ও তাওয়াফকারীকে হত্যা করে এবং নিহতদের যমযম কূপে নিক্ষেপ করে। যমযমের গম্বুয ধ্বংস করে, কাবার দ্বার উপড়ে ফেলে, কাবার গিলাফ ছিন্নভিন্ন করত নিজের সঙ্গীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। অতঃপর হাজারে আসওয়াদ উপড়ে ফেলে নিজের সাথে নিয়ে যায়, এটি ২২ বছর পর্যন্ত তার কাছে থাকে। বিশ্ব মুসলিমের আবেদনে আবূ তাহির আব্বাসীয় খলীফা কাহির বিল্লাহ এর আমলে হিজরী ৩৩৯ সালে হাজরে আসওয়াদ বাইতুল্লাহ শরীফে পৌঁছিয়ে দেয়। আবূ তাহির যখন হাজরে আসওয়াদ উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, পথে কয়েকটি উটে করে নিয়ে যায়, প্রত্যেক উটই এই বেহেশতী পাথর বহন করতে দারুণ কষ্টবোধ করে এবং আহতও হয়ে যায়। কিন্তু ফেরত আনার সময় এক ব্যক্তি সহজে নিয়ে আসে। হিজরী ৩১৭/৯২৯ সালের ৬ ডিসেম্বর কারামাতারা মক্কায় গণহত্যা চালায় এবং হাজরে আসওয়াদ উঠিয়ে নিয়ে যায়।

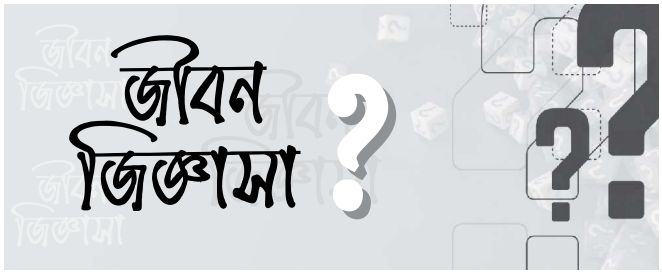

জবাব দিচ্ছেন-
মাওলানা আবূ নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান তাফাদার
প্রিন্সিপাল ও খতীব, আল ইসলাহ ইসলামিক সেন্টার
মিশিগান, আমেরিকা।

আমাতুল্লাহ, ঢাকা

প্রশ্ন: মাসিক পরওয়ানার জীবনজিজ্ঞাসা বিভাগে ইদ্দত পালনকারী মহিলাদের বর্জনীয় বিষয়ের মধ্যে চুল আচড়ানোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, একজন মহিলা ৪ মাস চুলে চিরুনি ব্যবহার না করে স্বাভাবিক থাকা সম্ভব নয় বরং চুলে জঠ পাকিয়ে যাবে। বিষয়টি কি এমনই না কি এক্ষেত্রে ভিন্ন কোনো ফয়সালা আছে?

জবাব: বিধবা নারী ইদ্দতকালীন সময়ে বর্জনীয় বিষয়াবলি কেবল সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে হলে নিষিদ্ধ। তবে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এসবের কিছু ব্যবহার করলে তা নিষিদ্ধ নয়। কেননা সৌন্দর্য প্রকাশ শোক পালনের পরিপন্থি। তাই চুল আঁচড়ানোর বিষয়টি সৌন্দর্য যখন প্রকাশের উদ্দেশ্যে না হয়ে প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে হবে, তখন তা জায়িয। এ সম্পর্কে তুহফাতুল ফুক্বাহা কিতাবে আছে,

ثم تفسير الإحداد هو الاجتناب عن جميع ما يتزين به النساء من الطيب ولبس الثوب المصبوغ والمطيب بالعصفر والزعفران والاكتحال والادهان والامتشاط ولبس الحلي والخضاب ونحو ذلك إلا إذا لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ فلا بأس بأن تلبسه ولا تقصد الزينة

وقال في الأصل ولا تلبس قصبا ولا خزا تتزين به لأن هذا مما يلبس للحاجة فيعتبر فيه القصد فإن قصدت الزينة يكره وإن لم تقصد فلا بأس

সারকথা হলো, বৈধব্য বা শোক পালনের বিশদ ব্যাখ্যা হচ্ছে- এমন সকল বিষয়াদি থেকে কোনো নারী বিরত থাকা যা দিয়ে সৌন্দর্য প্রকাশ করা হয়, যেমন সুগন্ধি ব্যবহার, রঙ্গিন কাপড় পরিধান .... ইত্যাদি। তবে কারো নিকট রঙ্গিন কাপড় ব্যতীত অন্য পোষাক না থাকলে সৌন্দর্য প্রকাশার্থে না হওয়ায় তার জন্যে তা পরিধান করা জায়িয। তদ্রুপ রেশমী পোষাক পরিধান ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে জায়িয। অর্থাৎ তাই এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিধান সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ প্রয়োজনের তাকিদে হলে জায়িয, সৌন্দর্য প্রকাশের জন্যে হলে মাকরূহ। (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫২)

কয়েছ আহমদ
আছিরগঞ্জ আলিম মাদরাসা
গোলাপগঞ্জ, সিলেট

প্রশ্ন: রুকু পরবর্তী দাঁড়ানো (কাওমাহ) ও দুই সিজদাহ এর মধ্যবর্তী বৈঠক (জালসাহ) এর মধ্যে তাসবীহ পড়া সম্পর্কে সবিস্তারে জানতে চাই। ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত- নফল নামাযে কোনো বিধানগত পার্থক্য আছে কি?

জবাব: রুকু পরবর্তী দাঁড়ানো (কাওমাহ) ও দুই সিজদাহ এর মধ্যবর্তী বৈঠক সুস্থির ভাবে করতে হবে, তবে ফরয ও ওয়াজিব নামাযে উভয় স্থানে মাত্র এক তাসবীহ পরিমাণ সময় থামা বাঞ্চনীয়। কোনো কোনো বর্ণনায় যে দীর্ঘ দুআ এসেছে তা মূলত নফল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই ফরয ও ওয়াজিব নামাযে রুকু পরবর্তী কাওমাহতে কেবল "রাব্বানা লাকাল হামদ" ও দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে "আল্লাহুম্মাগ ফিরলী" একবার বলা যেতে পারে। এর অধিক সময় ক্ষেপণ অনুচিত। কোনো কোনো ফকীহ এক তাসবীহ এর অধিক সময়ক্ষেপণে সাহু সিজদাহ আবশ্যক হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। রাদ্দুল মুহতার কিতাবে লিখেছেন:

أنه لو أطال هذه الجلسة أو قومة الركوع أكثر من تسبيحة بقدر تسبيحة ساهيا يلزمه سجود السهو

যদি মুসল্লী (ফরয ও ওয়াজিব নামাযের) দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক ভুলবশত এক তাসবীহ এর উপর অতিরিক্ত করে আরেক তাসবীহ পরিমাণ বিলম্বিত করে ফেলে, তাহলে তার সাহু সিজদাহ আবশ্যক হবে। (রাদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০৫)

হাসিবুর রহমান
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ

প্রশ্ন: নামাযে কখন কোন দিকে তাকাতে হবে? বিস্তারিত জানতে চাই।

জবাব: নামায একাগ্রতা, বিনয় ও নম্রতার সাথে আদায় করতে হয়। আর নামাযের একাগ্রতা রক্ষার্থে বিভিন্ন সময় ও অবস্থা অনুযায়ী দৃষ্টিকে কতিপয় নির্দিষ্ট বিষয়াবলির দিকে নিবদ্ধ রাখতে হয়।'আল মুহীতুল বুরহানী' কিতাবে এ সম্পর্কে আছে,

ومنها: أن يكون نظره في قيامه إلى موضع سجوده وفي الركوع إلى أصابع رجليه وفي السجود إلى أرنبة أنفه، وفي القعود إلى حجره،

নামাযে মনোযোগ ধরে রাখার পদক্ষেপের অন্যতম হচ্ছে, দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানের দিকে, রুকু অবস্থায় পায়ের আঙ্গুলের দিকে, সিজদার অবস্থায় নাকের ডগার দিকে এবং বসা অবস্থায় কোলের দিকে (রানের উপর) তাকানো। (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫২)

তাবয়ীনুল হাকাইক এর মধ্যে আছে,

وآدابها أي آداب الصلاة (نظره إلى موضع سجوده) أي في حالة القيام وفي حالة الركوع إلى ظهر قدميه وفي سجوده إلى أرنبته وفي قعوده إلى حجره وعند التسليمة الأولى إلى منكبه الأيمن وعند الثانية إلى منكبه الأيسر

-নামাযের অন্যতম শিষ্টাচার হচ্ছে, দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানের দিকে, রুকু অবস্থায় পায়ের পাতার উপরিভাগের দিকে, সিজদার অবস্থায় নাকের ডগার দিকে, বসা অবস্থায় কোলের দিকে (রানের উপর), প্রথম সালামের সময় ডান কাঁধের দিকে এবং দ্বিতীয় সালামের সময় বাম কাঁধের দিকে তাকানো। (তাবয়ীনুল হাকাইক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৮)

আরমান হোসেন
রাজনগর, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন: নামাযরত ব্যক্তির সরাসরি সামন দিয়ে কেউ না জেনে কিংবা ভুলে অতিক্রম করলে তার নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি?

জবাব: না, এতে নামাযরত ব্যক্তির নামাযে কোনো ক্ষতি হবে না। অবশ্য কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অতিক্রম করলে উক্ত অতিক্রমকারী গোনাহগার হবে। আর হাদীস শরীফের বর্ণনায় নামায ভঙ্গ হবে বলে যে সকল বর্ননা রয়েছে, সেগুলো ব্যাখ্যাসাপেক্ষ ও এগুলোর বাহ্যিক বিধান রহিত (মানসূখ) বলে ফকীহগণ মন্তব্য করেছেন। রাদ্দুল মুহতার কিতাবে আছে,

قوله (أو مروره إلخ) مرفوع بالعطف على مرور مار: أي لا يفسدها أيضا مروره ذلك وإن أثم المار

অর্থাৎ, নামাযের সামন কারো অতিক্রম করার দ্বারা নামাযীর নামায ফাসিদ হবে না, যদিও অতিক্রমকারী গুনাহগার হবে। (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৪)

রাদ্দুল মুহতার কিতাবে বিধান রহিত হওয়া প্রসঙ্গে আছে,

قوله (ولو امرأة أو كلبا) بيان للإطلاق، وأشار به إلى الرد على الظاهرية الأسود وإلى أن ما روي في ذلك منسوخ كما حققه في الحلية

কোনো কিছু এমনকি নারী কিংবা কুকুর নামাযের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলে নামায নষ্ট হবে না। এর দ্বারা আহলে জাহেরের উক্তি "নারী, কুকুর ও গাধা নামাযের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলে নামায নষ্ট হবে" বলে যে মন্তব্য রয়েছে এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর উক্তি- কালো কুকুর অতিক্রম করলে নামায বিনষ্ট হবে, তা খণ্ডন করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উপরন্তু, এর দ্বারা নামায বিনষ্ট হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত মতামত মানসুখ (রহিত) হওয়ার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে, যেমন হুলিয়াহ গ্রন্থকার বিশ্লেষণ করেছেন।

'লুমআত শরহে মিশকাত কিতাবে আছে,

والجمهور من الصحابة ومن بعدهم على انه لا يقطع شيء مما يمر والمراد من الاحاديث الواردة البالغة فى الحث على نصب السترة

সাহাবায়ে কিরাম তৎপরবর্তী মনিষীগণের বেশিরভাগের অভিমত হচ্ছে- নামাযরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী কোনো কিছুর দ্বারা নামায নষ্ট হয় না। এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের মর্মার্থ হলো- নামাযরত ব্যক্তির সম্মুখ সুতরাহ (আড়াল) স্থাপন করার বিষয়ে অধিক গুরুত্বারোপ করা। (মিশকাত শরীফ: হাশিয়াহ নং ৮, পৃষ্ঠা:৭৪)

মো. শাহজাহান
সহকারী শিক্ষক, কুলাউড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন: নিজের টাকা দিয়ে মসজিদের জন্য কোনো জিনিস ক্রয় করার সময় এরূপ ইচ্ছে ছিল যে, পরে মসজিদের তহবিল থেকে ঐ টাকা নিয়ে নিব। পরে উক্ত ক্রয় করা জিনিস হারিয়ে গেল এবং অনেক খোঁজ করার পরেও পাওয়া গেল না। এমতাবস্থায় কি মসজিদের তহবিল থেকে সে টাকা নেয়া জায়িয হবে?

জবাব: মসজিদ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কেউ মসজিদের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস নিজের টাকায় এ উদ্দেশ্যে ক্রয় করতে পারে যে পরে উক্ত টাকা মসজিদ ফাণ্ড থেকে সে নিয়ে নেবে। আর এরূপ করার পর ক্রয়কৃত বস্তু নিজের কোনো গাফলতির কারণ ব্যতীত অকস্মাৎ হারিয়ে গেলে, সে বস্তুর মূল্য মসজিদ ফাণ্ড থেকে তার পাওনা হিসেবে নেয়া জায়িয। তবে তা মসজিদে পৌঁছানোর পূর্বে তার গাফলতির কারণে হারিয়ে গেলে মসজিদের তহবিল থেকে সে মূল্য আদায় করে নেয়া জায়িয নয়।

মো. আব্দুর রহমান
মৌলভীবাজার

প্রশ্ন:১ মনোরোগ সম্পর্কে ইসলাম কী বলে? ওয়াসওয়াসাজনিত রোগ কী? এটা থেকে মুক্তির উপায় বা রুকইয়াহ কী?

প্রশ্ন:২ মনোরোগবিদ্যায় এমন কিছু মৃদু রোগ আছে যেগুলোর লক্ষণ শারীরিক, কিন্তু রোগটা মানসিক; (যেমন: প্যানিক, ভীতি ইত্যাদি) এমতাবস্থায় অনেক রোগী আছে যারা জামাআতের সাথে নামায পড়তে পারে না, এদের সম্পর্কে ইসলামের বিধান কি?

জবাব-১: ইসলামের বিধি-বিধানে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার রোগের অস্তিত্ব রয়েছে বলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় প্রকারের রোগ-ব্যাধি থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেন। হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে এসেছে:

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ، وَالجُنُونِ، وَالجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ»

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট কুষ্ঠ রোগ, মস্তিষ্কের উন্মাদনা, ধবল রোগ ও সকল দুরারোগ্য নিকৃষ্ট রোগ-ব্যাধি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। (সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৫৫৪)

ওয়াসওয়াসাজনিত রোগ শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রভাবের প্রতিফলন। সুতরাং এ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য আল্লাহর নিকট অধিক পরিমাণে আশ্রয় নেওয়ার বিকল্প নেই। তৎসঙ্গে আয়াতুল কুরসী, সূরা ফালাক ও সূরা নাস বেশি বেশি পড়া প্রয়োজন।

পবিত্র কুরআন মাজীদের নিম্নবর্ণিত আয়াত এ ক্ষেত্রে আশ্রয় প্রার্থনার দুআ হিসেবে বেশি বেশি পড়া যেতে পারে।

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

এ জাতীয় রোগে আক্রান্ত না হওয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলি আমলযোগ্য। যথা:

১. অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর করা ২. কুরআন তিলাওয়াত করা ৩. নামাযের পাবন্দি করা।

যিকর সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

-যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকর দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখো, আল্লাহর যিকর দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়। (সূরা রাআদ, আয়াত-২৮)

কুরআন মাজীদ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا

আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। গুনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৮২)

নামায সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

-মানুষতো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে। যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামায আদায়কারী। যারা তাদের নামাযে সার্বক্ষণিক কায়িম থাকে। (সূরা মাআরিজ, আয়াত: ১৮-২৩)

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ **وكان ﷺ إذا حزبه أمرٌ فزع إلى الصلاة** যখন পেরেশান হতেন নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। (আবূ দাউদ, হাদীস-১৩১৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বিলাল (রা.) কে বলতেন, **أقم الصلاة أرحنا بها** -নামাযের ইকামত দাও, এর মাধ্যমে আমাদেরকে প্রশান্তি দাও। (আবূ দাউদ)

আবূ সাঈদ (র.) থেকে বর্ণিত, জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বললেন, ইয়া মুহাম্মদ! আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (জিবরীল) বললেন,

بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ

অর্থাৎ, আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি, সে সব জিনিস থেকে, যা আপনাকে কষ্ট দেয়, সব প্রাণের অনিষ্ট কিংবা হিংসুকের বদ নযর থেকে আল্লাহ আপনাকে শিফা দিন; আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি। (মুসলিম: ৫৫১২)

উপরোক্ত দুআ পড়ে রোগীকে বারবার ফুঁ দিলে ফল হবে ইনশাআল্লাহ।

হাদীস শরীফে আরেকটি অর্থবহ দুআ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) কে এই বাক্যগুলো দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করতেন,

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

অর্থাৎ, আমি তোমাদের উভয়কে আল্লাহর কালামের আশ্রয়ে রাখতে চাই সব ধরনের শয়তান হতে, কষ্টদায়ক বস্তু হতে এবং সব ধরনের বদ-নযর

হতে। (বুখারী, হাদীস নং ৩৩৭১)

জবাব:২ উপরোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট রোগীর অবস্থা যদি এমন হয় যে, যদি সে জামাআতে নামায আদায় করলে তার দ্বারা অন্যের নামাযে ব্যাঘাত সৃষ্টির আশংকা থাকে, তাহলে সে মাজুর হিসেবে পরিগণিত হবে। তার জন্য একাকী নামায পড়া উত্তম হবে।

হোসাইন আহমদ
রবিরবাজার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন: কনুইয়ের উপরে জামার হাতা রেখে, কিংবা খাটো হাতাওয়ালা কাপড় যেমন গেঞ্জি পরিধান করে তথা কনুই অনাবৃত রেখে নামায আদায় করার বিধান কী? জানতে চাই।

জবাব: কনুইয়ের উপরে জামার হাতা রেখে কিংবা হাফ হাতা গেঞ্জি, টি-শার্ট, হাফ শার্ট বা জামার হাতা উল্টিয়ে কনুই খোলা রেখে নামায আদায় করলে নামায হয়ে যাবে। তবে এটা মাকরূহ তথা অপছন্দনীয় কাজ। আর কারো নিকট এমন পোষাক ছাড়া অন্য পোষাক না থাকলে তার জন্যে তা পরিধান করে নামায পড়া মাকরূহ হবে না। তবে নামায আদায়ের জন্যে পূর্ণ হাতা বিশিষ্ট এমন পোষাক নিজ সংগ্রহে রাখা জরুরি যা দ্বারা মাকরূহ ব্যতীত নামায আদায় হয়। কেননা নামাযে বান্দা তার মহান প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার সন্মুখে দাঁড়ায়। তাই আল্লাহর সামনে নিজেকে সর্বোচ্চ বিনয়ী হিসেবে পেশ করা জরুরি। আর হাফ হাতা পোষাক নামাযের আদব পরিপন্থি হওয়াতে মাকরূহ বলে পরিগণিত। তাই কনুই খোলা অবস্থায় নামায আদায় মাকরূহ। এ সম্পর্কে রাদ্দুল মুহতার কিতাবে লিখেছেন,

وقيد الكراهة في الخلاصة والمنية بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين. وظاهره أنه لا يكره إلى ما دونهما.

খোলাসাহ ও মুনিয়াহ কিতাবে কনুই পর্যন্ত অনাবৃত থাকা মাকরূহ হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত করা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট যে, কনুই থেকে কম অনাবৃত থাকলে মাকরূহ হবে না। (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪০)

এসম্পর্কে 'আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ' কিতাবে লিখেছেন:

ولو صلى رافعا كميه إلى المرفقين كره

-যদি কেউ কনুই পর্যন্ত হাত অনাবৃত রেখে নামায আদায় করে, তাহলে সেটা মাকরূহ হবে। (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৬)

আবার মাকরূহ হবে বলে উক্ত পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ব্যক্তি নামাযই ছেড়ে দিবে এটাও যেন না হয়।

শরাফত আলী
মিরপুর, ঢাকা

প্রশ্ন: নামাযের হারাম ওয়াক্ত কয়টি এবং এগুলোর স্থায়িত্বকাল কত সময়?

জবাব: শরীআতের বিধানানুযায়ী সর্বমোট তিনটি সময়ে নামায পড়া নিষিদ্ধ (মাকরূহে তাহরীমী)। যথা:

১. সূর্যোদয়ের পর থেকে ইশরাকের পূর্ব পর্যন্ত সময়-

সূর্য উঠা থেকে শুরু করে এর হলুদ আলো পুরোপুরি দূর না হওয়া পর্যন্ত এবং কিরণ এমন তীব্র না হওয়া পর্যন্ত যে স্বাভাবিক চোখে এর দিকে তাকিয়ে থাকা কষ্টকর অনুভূত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সময়টুকুতে সব ধরনের নামায পড়া নিষেধ। ফিকহবিদগণের গবেষণা অনুযায়ী সূর্য উঠার পর হলুদ আলো দূর হতে ন্যূনতম ১৫ মিনিট সময় লাগে। তাই সূর্য উদয় থেকে শুরু করে তৎপরবর্তী ১৫ মিনিট নামায আদায় নিষিদ্ধ।

২. দ্বিপ্রহরের সময়: সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপরে থাকে অর্থাৎ দ্বিপ্রহর, তখনও সব ধরনের নামায এবং সিজদা করা নিষেধ। যখন সূর্য একটু হেলে পড়বে তখন সে নিষিদ্ধতা দূর হবে এবং যুহরের ওয়াক্ত শুরু হবে। সূর্য মাথার ওপর থেকে হেলে পড়তে বেশি সময় লাগে না। তাই এক্ষেত্রে ফিকহবিদগণ সতর্কতাবশত দিক দ্বিপ্রহরের আগে ৫ মিনিট ও পরে ৫ মিনিট নিষিদ্ধ সময়ের আওতাভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। তাই এ সময়ে সব ধরনের নামায আদায় থেকে বিরত থাকা উচিত।

৩. সূর্যাস্তের সময়: সূর্য যখন হলুদ বর্ণ ধারণ করে ডুবতে শুরু করে তারপর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব ধরনের নামায পড়া নিষেধ। তবে সূর্যাস্ত শুরু না হওয়া পর্যন্ত কেবল ঐ দিনের আসরের ফরয আদায় করার বৈধতা রয়েছে।

ফকীহগণের অধিকাংশ এক্ষেত্রে সূর্যের প্রখরতা ও রং পরিবর্তন কে বিবেচ্য বলে রায় দিয়েছেন। যদিও কেউ কেউ একটি তীর পরিমাণ উপরে উঠা কিংবা উপরে থাকা ধর্তব্য বলে বিবেচনায় নিয়েছেন।

এ বিষয়ে দুররুল মুখতার কিতাবে আছে,

وتأخير (عصر) صيفا وشتاء توسعة للنوافل (ما لم يتغير ذكاء) بأن لا تحار العين فيها

(১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৩)

রাদ্দুল মুহতার কিতাবে আরো আছে,

قوله: في الأصح صححه في الهداية وغيرها. وفي الظهيرية إن أمكنه إطالة النظر فقد تغيرت وعليه الفتوى

(১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬৭)

জাবেদ হোসাইন

প্রশ্ন:১ জামাআতে নামায আদায়কালে কোনো মুসল্লীর ফরয বা ওয়াজিব ছুটে গেলে নামায সহীহ হবে কি?

প্রশ্ন:২ কোনো মেয়েলোকের নামায আদায়কালে তার শিশু সন্তান এসে স্তন চুষতে লাগল এবং গায়ে নাপাকি লাগানো অবস্থায় সিজদার স্থানে বসে পড়ল। এমতাবস্থায় তার করণীয় কী?

জবাব-১: জামাআতে শরীক হওয়া মুসল্লী ইমামের ইকতিদাকালীন যদি এমন কোনো ভুল করে যাতে সিজদায়ে সাহু আবশ্যক হয়, তাহলে তার কিংবা তার ভুলের কারণে ইমামের সিজদায়ে সাহু দেওয়ার বিধান নেই।

এ সম্পর্কে 'মাজমাউল আনহুর' কিতাবে আছে,

لا بسهوه أي لا يلزم سجود السهو بسهو المقتدي لا عليه ولا على إمامه لأنه إن سجد وحده خالف إمامه وإن سجد الإمام معه انقلب المتبوع تابعا والتابع متبوعا وهو قلب الموضوع ونقض المشروع

(১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৯)

তবে কোনো মুক্তাদির ফরয ছুটে গেলে সেজন্যে নামায সর্বাবস্থায় দুহরানো আবশ্যক হবে। আর মাসবুক হিসেবে আংশিক নামাযে শরীক হওয়া মুক্তাদী ইমামের সালাম ফেরানোর পর ছুটে যাওয়া অবশিষ্ট নামায একাকী পুর্ণ করার সময় এমন কোনো ভুল করলে যাতে সিজদায়ে সাহু আবশ্যক হয়, তাহলে তার সিজদায়ে সাহু দিতে হবে।

জবাব-২: নামাযরত অবস্থায় কোনো নারীর শিশু সন্তান যদি এক/দুই বার শুধু তার স্তন চুষে তাহলে তাতে নামায নষ্ট হবে না। তবে এমতাবস্থায় স্তন থেকে দুধ বের হলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে এবং দুহরানো আবশ্যক হবে।

আল বাহরুর রাইক কিতাবে লিখেছেন:

وكذا إذا مص صبي ثديها وخرج اللبن تفسد صلاتها

-অনুরূপ যখন কোনো শিশু (নামাযরত অবস্থায়) তার মায়ের স্তন চুষে এবং দুধ বের হয়, তখন নামায নষ্ট হবে।

(আল বাহরুর রাইক: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫;আল মুহীতুল বুরহানী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৯৫)

শিশু যদি তিন বা ততোধিক বার স্তন চুষে তাহলে দুধ বের হোক বা না হোক নামায ভেঙ্গে যাবে। এ বিষয়ে আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ কিতাবে লিখেছেন:

صَبِيٍّ مَصَّ ثَدْيَ امْرَأَةٍ مُصَلِّيَةٍ إِنْ خَرَجَ اللَّبَنُ فَسَدَتْ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ مَتَى خَرَجَ اللَّبَنُ يَكُونُ إرْضَاعًا وَبِدُونِهِ لَا. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَإِنْ مَصَّ ثَلَاثَ مَصَّاتٍ تَفْسُدُ صَلَاتُهَا وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ اللَّبَنُ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالْخُلَاصَةِ.
(১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৪)

আর সন্তান নাপাকী নিয়ে মায়ের সিজদার স্থানে বসে পড়লে নিকটবর্তী পবিত্র স্থানে সরে সিজদা করে নামায আদায় করবে।

মো. হারুনুর রশীদ
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ

প্রশ্ন: হযরত ওয়ায়েস কারনী (র.) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুহব্বতে দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছেন; এটি কি সত্য? জানতে চাই।

জবাব: লোকমুখে বহুল প্রচারিত এ ঘটনাটি বিশুদ্ধ নয়। কেননা নির্ভরযোগ্য কোনো সনদে এটি বর্ণিত হয়নি। আল্লামা ফরীদুদ্দীন আত্তার (র.) তার লিখিত তাযকিরাতুল আউলিয়া কিতাবে ঘটনাটি সনদবিহীনভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এ ঘটনাটি প্রমাণিত নয়।

তাই ঘটনাটি প্রচার করা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত।

আশরাফুল ইসলাম
কুমিল্লা

প্রশ্ন: জুমুআর খুৎবার আগে আযান দেওয়ার বিধান কী? কোন সময় থেকে এর প্রচলন হয়? কুরআন সুন্নাহর আলোকে বিষয়টি বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

জবাব: রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নিয়ে হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকাল পর্যন্ত জুমুআর শুধুমাত্র একটিই আযান ছিলো। আর সে আযান ইমাম সাহেব মিম্বরে আরোহন করার পরে মসজিদের ভিতরে দেওয়া হতো, অর্থাৎ আমাদের নিকট জুমুআর দ্বিতীয় আযান হিসেবে যে আযান পরিচিত তা ছিলো জুমুআর প্রথম ও একমাত্র আযান।

এ সম্পর্কে সুনান তিরমিযীর হাদীসে এসেছে:

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، «أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ خِلَافَةُ عُثْمَانَ، وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ

(সুনান আত তিরমিযী, হাদীস নং ১০৮৭)

অতঃপর হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতকালে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনবসতির বিস্তৃতির কারণে হযরত উসমান (রা.) এর নির্দেশে মসজিদের বাইরে বর্তমানে প্রচলিত প্রথম আযানের সূচনা হয়।

যেহেতু হযরত উসমান (রা.) এর এ কাজকে তৎকালীন সময়ের সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের সকলেই কোনো আপত্তি ছাড়াই মেনে নেন, সুতরাং এ আযান সাহাবায়ে কিরামের মৌন ইজমা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ (رواه احمد)

অর্থাৎ তোমাদের জন্য আমার সুন্নত এবং আমার সৎপথে পরিচালিত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা অপরিহার্য। তোমরা তা শক্তভাবে ধারণ করো এবং মাড়ির দাঁত দ্বারা কামড়ে ধরো।

উক্ত হাদীস শরীফ অনুযায়ী এ আযান খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। (বুখারী, জুমুআ অধ্যায়; আবূ দাউদ, সালাত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা

- ধর্ম-দর্শন, মাসআলা-মাসাইল, ফাদ্বাইল ও আমালিয়াত বিষয়ে লিখুন
- ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, সমসাময়িক, দেশজ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ লেখা পাঠান
- মুসলিম মনীষী, আউলিয়াদের জীবন ও গৌরবময় অতীতের আলোকোজ্জ্বল কাহিনি তুলে আনুন আপনার লেখায়

প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পরবর্তী সংখ্যার জন্য নিম্নোক্ত ই-মেইলে লেখা পাঠাতে হবে
E-mail: parwanabd@gmail.com

পরওয়ানা-এর গ্রাহক হওয়া যাচ্ছে

নিকটস্থ এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন

বার্ষিক চাঁদার হার

বাংলাদেশ	ঃ ৩০০ টাকা
ভারত	ঃ ১৫০০ টাকা
মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশ	ঃ ২০০০ টাকা
যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের সকল দেশ	ঃ ৪০ পাউন্ড/ইউরো
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা	ঃ ৫০ মার্কিন ডলার

এজেন্সির নিয়মাবলি

- ফোন/ই-মেইল/হোয়াটসঅ্যাপ ও অফিসে যোগাযোগ করে চাহিদা জানালে এজেন্সি দেওয়া হয়
- ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না
- প্রত্যেক ৫ কপিতে ১টি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়
- সরাসরি এজেন্টের কাছে পত্রিকা পৌঁছানো হবে
- আশেপাশের এজেন্টের ক্ষতি হবে না, এমন নিশ্চয়তা থাকতে হবে।
- যেকোনো সময় কর্তৃপক্ষ যে কারো এজেন্টশিপ বাতিল/পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। সেক্ষেত্রে গ্রাহকদের বিকল্প মাধ্যমে পত্রিকা পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে

যোগাযোগ
সার্কুলেশন ম্যানেজার
মাসিক পরওয়ানা
ফুলতলী কমপ্লেক্স, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন, ৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০

অভ্যন্তরীণ

সুনামগঞ্জের হাওরে হচ্ছে উড়াল সড়ক : একনেকে প্রকল্প অনুমোদন

সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলায় সড়ক সংযোগের লক্ষ্যে সুনামগঞ্জের হাওরে নির্মিত হচ্ছে প্রায় ১১ কিলোমিটার উড়াল সেতুসহ ১৭০ কিলোমিটার সড়ক । এজন্য 'হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে সরকার। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা মহাসড়কের মান্নানঘাট থেকে গোল্লাগ্রাম হয়ে ধর্মপাশার মধুপুর পর্যন্ত উড়াল সেতুসহ সড়ক নির্মাণ করার পাশাপাশি সাব মার্সিবল সড়ক ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। এ লক্ষ্যে গত লক্ষ্যে নভেম্বর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় এ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার এ প্রকল্পটি নভেম্বর ২০২১ থেকে জুন ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। **এ প্রসঙ্গে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন,** প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা, তাহিরপুর, জামালগঞ্জ ও দিরাই উপজেলা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আসবে এবং হাওর এলাকায় সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন এবং উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সহযোগিতা হবে।

চলতি বছরে দেশে করোনায় প্রথম মৃত্যুহীন একটি দিন

চলতি বছরে দেশে প্রথমবারের মতো ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কারো মৃত্যু হয়নি। গত ১৯ নভেম্বর, শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন ও আরটি-পিসিআর পদ্ধতিতে ১৫ হাজার ১০৭টি নমুনা পরীক্ষা করে ১৭৮ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ১ দশমিক ১৮ শতাংশ। আশাব্যঞ্জক ঘটনা হলো, এদিন করোনায় প্রথমবারের মতো দেশে কারও মৃত্যু হয়নি। এ নিয়ে দেশে এ পর্যন্ত মোট ১৫ লাখ ৭৩ হাজার ৮৮৯ জনের করোনা শনাক্ত হলো। অন্যদিকে, এ পর্যন্ত করোনায় ২৭ হাজার ৯৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত ২০ নভেম্বর, শনিবার বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে দেওয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

করোনার ট্যাবলেট বাজারজাতকরণের অনুমোদন পেল দেশীয় প্রতিষ্ঠান

দেশের দু'টি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিকে প্রথমবারের মতো করোনার ওষুধ 'মলনুপিরাভির' বাজারজাতকরণের অনুমোদন দিয়েছে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর (ডিজিডিএ)। কোম্পানিগুলো হলো এসকায়েফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড ও বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড।

গত ৯ নভেম্বর, মঙ্গলবার দুপুরে এক ব্রিফিংয়ে ডিজিডিএ'র মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমান সাংবাদিকদের এ কথা জানান। তিনি আরও জানান, দেশে আরও ৮টি সংস্থা এই ওষুধটি বাজারজাতকরণের জন্য অনুমোদন চেয়েছে, তন্মধ্যে সরকার দু'টি কোম্পানিকে ওষুধ উৎপাদনের অনুমতি দিয়েছে। ওষুধটি করোনা রোগীর মৃত্যু ও হাসপাতালে ভর্তির হার ৫০ শতাংশ কমাতে পারে এবং এটি চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ব্যবহার করা যাবে।

মার্কিন ওষুধ কোম্পানি মার্ক, শার্প অ্যান্ড ডোহম (এমএসডি) এবং রিজব্যাক বায়োথেরাপটিকসের 'মলনুপিরাভির' করোনা চিকিৎসায় প্রথম অ্যান্টিভাইরাল ট্যাবলেট, যা ইনজেকশনের মাধ্যমে পুশ না করে ওষুধ হিসেবে খাওয়া যাবে। দেশে অনুমোদনের ৪ দিন আগে যুক্তরাজ্য সরকার এ ওষুধের অনুমোদন দেয়। যুক্তরাজ্যে অনুমোদনের ৪ দিন পর দেশে ওষুধটির উৎপাদন ও ব্যবহারের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হলো।

ঢাবি, গুচ্ছ, নিটোর ও ৭ কলেজে প্রথম মাদরাসা শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিট, গুচ্ছভুক্ত ২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বি' ইউনিট, নিটোর ও সরকারি ৭ কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন মাদরাসা শিক্ষার্থীরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদভুক্ত 'খ' ইউনিটে সর্বমোট নম্বর পেয়ে প্রথম হন মাদরাসা শিক্ষার্থী মুহাম্মাদ জাকারিয়া। গুচ্ছভুক্ত ২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বি' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছেন মাদরাসা শিক্ষার্থী রাফিদ হাসান সাফওয়ান। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের (নিটোর) ভর্তি পরীক্ষায়ও প্রথম হয়েছেন মাদরাসা শিক্ষার্থী। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজের কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় সর্বমোট নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছেন মাদরাসা শিক্ষার্থী নাজমুল ইসলাম। উল্লেখিত **ঢাবি, গুচ্ছ, নিটোর ও ৭ কলেজে প্রথম হওয়া শিক্ষার্থীরা সবাই ঢাকার দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদরাসার** শিক্ষার্থী। এ বিষয়ে **দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আ. খ. ম. আবূ বকর সিদ্দিকের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি মাসিক পরওয়ানাকে বলেন,** বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষার্থীদের ভালো করার বিষয়টি অবশ্যই আমাদের জন্য গর্বের। তবে, শিক্ষার্থীদের যে প্রথম হতেই হবে, সেটা আমাদের মূল লক্ষ্য না। শিক্ষার্থীদের আমরা সর্বোচ্চটাই দেওয়ার চেষ্টা করি। তারা যাতে পড়াশোনার মধ্যে থাকে, সেটাই আমাদের প্রচেষ্টা থাকে। আমরা তাদের একটা শৃঙ্খলাবোধের মধ্যে রাখার চেষ্টা করি।'

মাদরাসার শিক্ষার্থীরা বলছেন, মাদরাসার পাঠদান পদ্ধতি ও শিক্ষকদের আন্তরিকতা তাদের ভালো ফলাফলের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাদরাসা শিক্ষার্থীদের এমন ফলাফল নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য এবং মাদরাসা শিক্ষার ব্যাপারে কতিপয়ের নেতিবাচক প্রচারণাকে ভুল প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। মাদরাসার শিক্ষার্থীরা যে শুধু ধর্ম শিক্ষায়ই পারদর্শিতা অর্জন করে না বরং ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞানসহ সব বিষয়েই দক্ষতা অর্জন করে তা তাদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলাফল থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিশোরগঞ্জের হাওরে হবে এলিভেটেড সড়ক

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জলাভূমিকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে সরকার কিশোরগঞ্জের হাওরের উপর দিয়ে ১১ কিলোমিটার এলিভেটেড সড়ক নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পটিতে ব্যয় হবে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা। এই প্রকল্পটি সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে হাওর এলাকায় সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ করে কৃষি ও মৎস্য সম্পদ উৎপাদন, বিপণন ও দ্রুততর সময়ে পরিবহণে সহায়তা করবে এবং দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলে পর্যটনকে আরও সমৃদ্ধ করবে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করছেন।

চীনের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে,এ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা, তাহিরপুর, বিশ্বম্ভরপুর ও জামালগঞ্জ উপজেলা এবং নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা উপজেলা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আসবে। এ প্রকল্পের আওতায় ১০ দশমিক ৮ কিলোমিটার এলিভেটেড সড়কের পাশাপাশি সব মৌসুমে ব্যবহার উপযোগী ৯৭ দশমিক ৮৬ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক ও ২০ দশমিক ২৭ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ করা হবে। এছাড়া পানিতে তলিয়ে যাবে এমন ১৬ দশমিক ৫৩ কিলোমিটার উপজেলা ও ২২ দশমিক ৮৬ কিলোমিটার ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক এবং ৫৭টি সেতু ও ১১৮টি কালভার্ট নির্মাণ করা হবে।

৫০ টাকার জন্য অক্সিজেন মাস্ক খুলে নেওয়ায় রোগীর মৃত্যু

চাহিদা অনুযায়ী বকশিশ না পেয়ে রোগীর মুখ থেকে অক্সিজেনের মাস্ক খুলে নেওয়ার ঘটনা ঘটিয়েছেন বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্মচারী আসাদুল ইসলাম ধলু। র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি অক্সিজেন মাস্ক খুলে নেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। গত ৯ নভেম্বর, রাত সাড়ে ১০টার দিকে হাসপাতালটির সার্জারি বিভাগে আসাদুল ইসলাম মুখ থেকে অক্সিজেন মাস্ক খুলে নেওয়ার পর বিকাশ চন্দ্র কর্মকার (১৫) নামের রোগী মারা যান বলে তার স্বজনরা জানান। গাইবান্ধার কুমিরাডাঙ্গার অধিবাসী অভিযুক্ত আসাদুল ইসলাম হাসপাতালটির দৈনিক মজুরিভিত্তিক একজন কর্মী এবং হাসপাতালের জরুরি আউটডোরে রোগীদের ট্রলিতে করে পৌঁছে দেওয়াসহ দালালির কাজ করতেন বলে জানা যায়।

মৃত্যুবরণকারী বিকাশ গাইবান্ধার একটি স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন এবং পড়াশোনার পাশাপাশি সে স্থানীয় একটি ওয়ার্কশপে কাজ করতেন। গত ৯ নভেম্বর, সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বগুড়া মেডিকেলে নেওয়ার পর চিকিৎসকের পরামর্শমতো জরুরি সেবা দিয়ে অক্সিজেন মাস্ক লাগিয়ে ভর্তি করা হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মচারী আসাদুল ইসলাম টাকার বিনিময়ে শয্যা দেওয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু বিকাশের পরিবার চাহিদামতো টাকা দিতে না পারায় উত্তেজিত হয়ে আসাদুল একপর্যায়ে বিকাশের অক্সিজেন মাস্ক খুলে দিলে তার মৃত্যু ঘটে।

বজ্রপাতে মৃত্যু কমাতে বাংলাদেশে নতুন উদ্যোগ

বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যু কমিয়ে আনার লক্ষ্যে নতুন একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। ৩০০ কোটি টাকা বাজেটের এ প্রকল্পের আওতায় হাওর অঞ্চলে এক হাজার কংক্রিটের শেল্টার হোম নির্মাণ করা হবে ও এসব শেল্টারে বজ্রপাত নিরোধক যন্ত্র স্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান। এছাড়াও আগাম সতর্কতা দেওয়ার জন্য ৭২৩টি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে, যেসব কেন্দ্র থেকে স্থানীয় অধিবাসীদের বজ্রপাতের ৪০ মিনিট আগে মোবাইলে বার্তা পাঠানো হবে, যাতে তারা নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারেন। মানুষকে আগাম সতর্কতা দেওয়ার জন্য একটি অ্যাপ বানানো হবে বলেও প্রতিমন্ত্রী জানান।

LATIFI HANDS
CHARITY WITH CLARITY

LATIFI HANDS

FULTALI SAHEB BARI, ZAKIGANJ, SYLHET, BANGLADESH

OUR PROJECTS

EDUCATION
ORPHANS
HOUSING PROJECTS
MASJID PROJECTS
INFRASTRUCTURE
SUSTAINABLE LIVELIHOODS
AGRICULTURE SUPPORT
WEEDING SUPPORT
SADAQAH PROJECT

HEALTH CARE
EYE CARE
GIFT
QURBANI PROJECT
EMERGENCY AND DISASTER RELIEF
BLIND AND DISABLED PROJECT
WATER PROJECT
WIDOW SUPPORT

www.youtube.com/latifihands
www.facebook.com/latifihands
www.latifihands.org.uk

আন্তর্জাতিক

আমেরিকায় আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলীর দাওয়াতী সফর : মুসলিম কমিউনিটিতে ব্যাপক উচ্ছ্বাস

মুরশিদে বরহক হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী গত ১ নভেম্বর এক সংক্ষিপ্ত দাওয়াতী সফরে যুক্তরাষ্ট্র গমন করেন। ২ নভেম্বর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে পৌঁছলে সেখানে বসবাসরত আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ ও মুসলিম কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। দাওয়াতী সফরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, মিশিগান, নিউজার্সিসহ বিভিন্ন শহরে আয়োজিত দারসে কুরআন, দারসে হাদীস, খানেকা, যিকর, মিলাদ ও দুআ মাহফিলে তালিম-তারবিয়াত প্রদান করেন। এসময় তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন বাংলাদেশ আনজুমানে আল-ইসলাহ'র সভাপতি হযরত আল্লামা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী, দারুল হাদীস লতিফিয়া ইউকের প্রিন্সিপাল মাওলানা মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী ও মুসলিম হ্যান্ডস বাংলাদেশর কান্ট্রি ডিরেক্টর মাওলানা গুফরান আহমদ চৌধুরী ফুলতলী। পরে ২৩ নভেম্বর দাওয়াতি সফর শেষে তিনি দেশে প্রত্যাগমন করেন।

হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী যুক্তরাষ্ট্রে দাওয়াতি সফরকালে বিভিন্ন শহরে আয়োজিত মাহফিলগুলোর মধ্যে তিনি ৩ নভেম্বর আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ আয়োজিত যিকর মাহফিল, ৬ নভেম্বর আল-ইহসান ইসলামিক সেন্টার ওয়ারেন মিশিগান আয়োজিত দারসে হাদীস মাহফিল, ৭ নভেম্বর আনজুমানে আল-ইসলাহ মিশিগান স্টেট ও আল ইসলাহ ইসলামিক সেন্টার মিশিগান'র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ২দিনব্যাপী মাহফিল, ৮ নভেম্বর দারুল হাদীস লতিফিয়া ইউএসএ-এর হিফয বিভাগের ছাত্রদের পাগড়ী প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ মাহফিল এবং বাংলাবাজার জামে মসজিদ ব্রঙ্কস আয়োজিত বিশেষ মাহফিল, ১০ নভেম্বর আনজুমানে আল ইসলাহ নিউইয়র্ক স্টেট আয়োজিত তারবিয়াত মাহফিল, ১৩ নভেম্বর আনজুমানে আল ইসলাহ নিউজার্সি স্টেট ও পেটার্সন মসজিদ আল-ফেরদৌস আয়োজিত দারসে হাদীস ও খানেকা মাহফিল এবং শাহজালাল লতিফিয়া ইসলামিক সেন্টার নিউজার্সি আয়োজিত দারুল কিরাতের তালিম অনুষ্ঠান, ১৪ নভেম্বর আনজুমানে আল ইসলাহ পেনসিলভেনিয়া স্টেট আয়োজিত তারবিয়াত মাহফিল, ১৫ নভেম্বর পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ নিউইয়র্কে আয়োজিত তারবিয়াত মাহফিল, ১৭ নভেম্বর ফুলতলী জামে মসজিদ এন্ড ইসলামিক ইনস্টিটিউট ওজনপার্ক আয়োজিত দারসে হাদীস এবং আল আমীন জামে মসজিদ এস্টোটিয়া আয়োজিত তারবিয়াত মাহফিল, ১৮ নভেম্বর হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ জামে মসজিদ ইউএসএ আয়োজিত তারবিয়াত মাহফিল এবং ম্যানহাটনে মাওলানা মুখলেসুর রহমান'র ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত মাহফিল, ১৯ নভেম্বর নিউইয়র্কের গাউছিয়া জামে মসজিদ, আহলে বাইত মিশন ও ফুলতলী ইসলামিক সেন্টার নিউইয়র্ক আয়োজিত তারবিয়াত মাহফিলে তিনি তালিম-তারবিয়াত প্রদান করেন।

মুসলিম কমিউনিটিতে ব্যাপক উচ্ছ্বাস : এদিকে প্রায় ২০ বছর পর মুরশিদে বরহক হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলীর যুক্তরাষ্ট্রে দাওয়াতি সফর উপলক্ষে সেখানে বসবাসরত মুসলিম কমিউনিটিতে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গেছে। তাঁর গমন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে আয়োজিত দারসে কুরআন, দারসে হাদীস, যিকর, তালিম-তারবিয়াত, মীলাদ ও দুআ মাহফিলের আয়োজনগুলোতে ছিল বিপুল জনসমাগম। দীর্ঘদিন পর হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী'র সান্নিধ্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মুসলিম জনতা তাদের আত্মার খোরাক পেয়েছেন এবং আল্লাহর দ্বীনের পথে চলার অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। এছাড়াও তাঁর দাওয়াতী এ সফর দীর্ঘতর না হওয়া ও আরও দীর্ঘ সময় সান্নিধ্য না পাওয়ার আক্ষেপও সেখানকার কমিউনিটিতে পরিলক্ষিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ'র মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুন নুর বলেন, আমাদের আধ্যাত্মিক রাহবার আল্লামা ইমাদ উদ্দীন চৌধুরী ফুলতলীর আমেরিকা সফরকালে বিভিন্ন স্টেটে দ্বীনি খিদমাতের এক নূরানী আবহের সৃষ্টি হয়েছিল যা বর্ণনাতীত। বিশেষ করে পথভুলা মানুষের আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে এ সফর যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। দারসে বুখারী,কুরআন শরীফের মশক,দালাইলুল খাইরাত ও হিযবুল বাহার ওয়াযীফার মাহফিলগুলোর মাধ্যমে সকলেই উপকৃত হয়েছেন।

মাওলানা আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা বলেন, আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলীর মাহফিল মানেই মুহূর্তেই স্বপ্নজগতে হারিয়ে যাওয়া। দারসে হাদীসের মাহফিলে তাঁর কথাগুলো ছিল জীবন্ত এবং এতে সব বয়স ও শ্রেণি-পেশার মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ'র সদস্য মাওলানা আবুল কাশেম ইয়াহইয়া বলেন, হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ও মাওলানা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলীর যুক্তরাষ্ট্র সফর আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ'র সর্বস্তরের দায়িত্বশীলের সাংগঠনিক কর্মতৎপরতাকে বৃদ্ধি করেছে।

আনজুমানে আল ইসলাহ নিউইয়র্কের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা হাফিয কাওছার আহমদ বলেন, আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলীর যুক্তরাষ্ট্র সফর মুসলিম কমিউনিটিতে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার জন্ম দিয়েছে। তারবিয়াত ও খানেকা মাহফিলগুলো মুসলিম সাধারণ জনগণকে তাযকিয়ায়ে নাফসের দিকে ধাবিত করেছে।

ভারতে লতিফিয়া দারুল ক্বিরাত সমিতির খামিছ ফাইনাল পরীক্ষা সম্পন্ন

লতিফিয়া দারুল ক্বিরাত সমিতি ভারত পরিচালিত দারুল কিরাতের খামিছ (২য় বর্ষ) ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১১ নভেম্বর আসাম রাজ্যের বদরপুর বুন্দাশিলের ইয়াকুবিয়া কমপ্লেক্সে লতিফিয়া দারুল ক্বিরাত সমিতির কার্যালয়ে সকাল দশ ঘটিকা থেকে বিকাল চার ঘটিকা পর্যন্ত এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, অতিমারী কোভিড-১৯ এর ফলে ২০২০ সালের রামাদানুল মুবারকে বিশ্বের কোথাও দারুল কিরাত পরিচালনা করা যায়নি। ২০২১ সালের রামাদান মাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় অর্ধশতাধিক দারুল কিরাত শাখা কেন্দ্রের অনুমোদন দিয়ে দারুল ক্বিরাত পরিচালনার যাবতীয় প্রস্তুতি নেয় ভারত লতিফিয়া দারুল ক্বিরাত সমিতি। প্রথম রামাদান থেকে "দারুল ক্বিরাত" এর কার্যক্রম শুরু হলেও আচমকা করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় পর্যায়ের তাণ্ডব শুরু হলে সরকার ঘোষিত লকডাউনের কারণে রামাদানের মাঝামাঝি সময়ে দারুল ক্বিরাতের সকল কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করে সমিতি। রামাদান পরবর্তী সময়ে জামাতে খামিছ ২য় বর্ষ ব্যতীত সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পরবর্তী ক্লাসে প্রমোশন দেওয়ার ঘোষণা দেন সমিতির কর্মকর্তারা। সরকার কর্তৃক লকডাউন তুলে দেওয়া এবং স্কুল-কলেজ খুলে দেওয়ার ঘোষণার সুত্র ধরে গত ১১ নভেম্বর বুধবার এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের ২য় হিফয গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন

যুক্তরাজ্যের অন্যতম বৃহৎ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সে প্রতিষ্ঠিত দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের ২য় হিফয গ্রাজুয়েশন ও এ্যাওয়ার্ড সিরিমনি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ২২ নভেম্বর, সোমবার কমপ্লেক্সের অন্যতম ট্রাস্টি আলহাজ নাছির আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে'র প্রেসিডেন্ট শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল জলিল। মাহফিলে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে'র ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা নজরুল ইসলাম, জেনারেল সেক্রেটারি ও দারুল হাদীস লতিফিয়ার প্রিন্সিপাল মাওলানা মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী, বার্মিংহাম সিরাজাম মুনিরা ইসলামিক সেন্টারের খতিব ও বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার সাইয়্যিদ শেখ ফাদি যুবা ইবনে আলী, লতিফিয়া কারী সোসাইটি ইউকে'র প্রেসিডেন্ট মুফতি ইলিয়াছ হোসাইন ও সেক্রেটারি

মাওলানা আশরাফুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান ও অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল মাওলানা এম এ কাদির আল হাসান।

মাহফিলে এ বছর হিফয সম্পন্নকারী ছাত্রদের গ্রাজুয়েশন প্রদান করা হয় এবং কমপ্লেক্সের নতুন প্রায় দেড়শো জন ফাউন্ডার ও লাইফ মেম্বারকে সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়। ব্রিটেনের বিভিন্ন শহর থেকে পুরুষ, মহিলা, শিশু-কিশোরসহ নানা পেশার বিপুল সংখ্যক দর্শক এতে উপস্থিত ছিলেন। মাহফিলে হিফয সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীরা তাঁদের সুললিত কন্ঠে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করলে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এসময় হল জুড়ে উপস্থিত দর্শকরা আবেগে আপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

মালালার বিয়ের খবরে হতবাক তসলিমা নাসরিন

পাকিস্তানের নারীশিক্ষা অধিকারকর্মী ও শান্তিতে নোবেল জয়ী মালালা ইউসুফজাই বিয়ে করেছেন। গত ৯ নভেম্বর, লন্ডনের বার্মিংহামে তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। এক টুইট বার্তায় মালালা এ দিনটিকে তার জীবনের মহামূল্যবান দিন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

এর আগে চলতি বছরের জুলাইয়ে জনপ্রিয় একটি সাময়িকীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মালালা বলেছিলেন,'আমি এখনও বুঝতে পারিনা কেন মানুষকে বিয়ে করতে হবে। আপনি যদি একজন জীবনসঙ্গী চান, তাহলে কেন বিয়ের কাগজপত্রে সই করতে হবে। এটা কি শুধু একটি অংশীদারত্ব হতে পারে না?' তার এই মন্তব্য ব্যাপক সমালোচিত হয়। এই মন্তব্যের চার মাস পর নিজেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেন মালালা। অবশ্য এখন সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়েকে দেখছেন বলে জানিয়েছেন মালালা।

এদিকে মালালা ইউসুফজাই'র বিয়ের পিড়িতে বসা নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন আবারো আলোচনায় এসেছেন। তসলিমা বলেন, "এটা অবশ্যই পিতৃতান্ত্রিক উপমহাদেশে নারী অধিকার আদায় আন্দোলনের জন্য একটি চরম ধাক্কা। ভেবেছিলাম মালালা যেহেতু বুদ্ধিমতি, সে কোনও স্মার্ট, হ্যান্ডসাম, প্রগ্রেসিভ যুবকের সঙ্গে প্রেম করে তার পছন্দের লিভ ইন সম্পর্ক করবে। যেহেতু ইংরেজের দেশে থাকে, কোনও ইংরেজের সঙ্গেই হয়তো। নিজে অক্সফোর্ডের অধ্যাপক হয়ে অক্সফোর্ডের আরেক অধ্যাপকের সঙ্গেই হয়তো। অথচ সর্বোচ্চ ডিগ্রি না নিয়েই মাত্র ২৪ বছর বয়সে বিয়ে করে বসলো মালালা, তাও এক পাকিস্তানি মুসলিমকে!"

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের বাড়ির ছবি তুলে আটক ইসরায়েলি 'গুপ্তচর' দম্পতি!

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোয়ান'র বাড়ির ছবি তোলার পর গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে এক ইসরায়েলি দম্পতি ও তুরস্কের এক নাগরিককে আটক করা হয়েছে। গত ১২ নভেম্বর ইস্তাম্বুলের কামলিকা টাওয়ার থেকে তারা ছবি তোলেন। টাওয়ারের রেস্টুরেন্ট সেকশনের এক কর্মচারী ওই ইসরায়েলিদের ছবি তুলতে দেখেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ হাজির হয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়। তুর্কি কর্তৃপক্ষ জানায়,তিন সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সামরিক গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ আনা হয়েছে। এদিকে বিদেশি গুপ্তচর আটক নিয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তুরস্কে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মুসলিম শাসিত শহর হ্যামট্রামিক

অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান রাজ্যের শহর হ্যামট্রামিকে। এ মাসের শুরুতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে শহরটির মেয়র ও কাউন্সিলম্যান হিসেবে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা সবাই মুসলমান। এর মধ্যে দু'জন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত। হ্যামট্রামিক শহরের ৩০ হাজার বাসিন্দার অর্ধেকেরও বেশি অভিবাসী। যাদের অধিকাংশই মুসলমান। যার প্রভাব পড়েছে স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এটি একটি অনন্য ঘটনা। এ প্রসঙ্গে হ্যামট্রামিকের নবনির্বাচিত মেয়র আমির গালিব বলেন, মুসলিম সরকার হিসেবে আমরা উদাহরণ তৈরি করতে চাই। আমরা সবার প্রতিনিধিত্ব করবো। মুসলিম হিসেবে আমার বিশ্বাস অন্য কারো ওপর চাপিয়ে দিতে চাইবো না। শহরের ৫০ ভাগই মুসলিম, তবে সংখ্যালঘুরা যাতে বঞ্চিত মনে না করে, সেটাও খেয়াল রাখবো। সততা, স্বচ্ছতা, শক্তিশালী নেতৃত্ব, সদিচ্ছার মতো ইসলামিক মূল্যবোধগুলো প্রদর্শন করতে হবে।

কাউন্সিলম্যান খলিল রেফাই বলেন, এটা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম শহর, যেখানে সব জনপ্রতিনিধি মুসলিম। তাই অনেকেরই নযর আছে এখানে। আমাদের প্রমাণ করতে হবে, মুসলিমরাও নেতৃত্ব দিতে পারে, পরিবর্তন আনতে পারে।

পরাজয় স্বীকার করলেন নরেন্দ্র মোদী

ভারতের 'কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল' অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। গত ২৪ নভেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিলটি চূড়ান্ত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডাকা মন্ত্রীসভার বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংসদের শীতকালীন অধিবেশনেই আইন প্রত্যাহারের সব প্রক্রিয়া সেরে ফেলা হবে। এ ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

বিতর্কিত তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে দেড় বছর ধরে ভারতের কৃষক সমাজ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। লক্ষ লক্ষ কৃষক প্রবল শীত, ভীষণ গরম ও করোনা মহামারির ভয়াবহতার মধ্যেও দিল্লির প্রবেশপথগুলোতে অবস্থান করে বিক্ষোভ চালিয়ে গেছেন। এই সময়ে কৃষক সংগঠনগুলোর সঙ্গে সরকার বারবার আলোচনা চালিয়েছে। আইনগুলো সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করতে কখনই রাজি হয়নি মোদী সরকার। আন্দোলন চলাকালীন প্রায় ৭০০ কৃষক মারা যান। অবশেষে তাঁদের সেই আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১৯ নভেম্বর তিনটি আইনই প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন।

লতিফিয়া হিফযুল কুরআন মাদরাসা সিলেট

প্রধান উপদেষ্টা: হযরত আল্লামা মুফতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

সীমিত সংখ্যক আসনে

ভর্তি চলছে

মাদরাসার বৈশিষ্ট্য

- স্বল্প সময়ে হিফয সমাপনের বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ
- মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে ভর্তি
- হিফযের পাশাপাশি বয়স অনুপাতে সাধারণ শিক্ষা দান।
- সুন্নতে নববীর অনুসরণ
- আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতাদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধান
- রুটিন ভিত্তিক সু-শৃঙ্খল পাঠদান ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা
- নৈতিক মানোন্নয়নে আখলাকী তা'লিম তরবিয়ত প্রদান
- ইবতেদায়ী সমাপনী ও জেডিসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা
- সনদপ্রাপ্ত কারীগণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষার বিশেষ প্রশিক্ষণ।
- বিদেশী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ
- শিক্ষা সফর ও ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ

আবাসিক
অনাবাসিক

যোগাযোগ

জায়ান কমপ্লেক্স, রাগিব-রাবেয়া মেডিকেল রোড
পাঠানটুলা, সিলেট। মোবা: ০১৭৯৭-৪৩৪২৪২

নজীর আহমদ হেলাল
পরিচালক
মোবাইল: ০১৭১২৪৯৬৬৯৯

জানার আছে অনেক কিছু

গালুয়া পাকা মসজিদ

ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামে অবস্থিত গালুয়া পাকা মসজিদ। মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপি হতে জানা যায়, বাংলা ১১২২ সনে মাহমুদ খান আকন নামে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মসজিদটি নির্মাণ করেন। প্রায় তিনশ' বছর পূর্বে নির্মিত এই মসজিদটি টালি ইটের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। একটি পরিত্যক্ত শিলাখণ্ডে এটি নির্মাণের তারিখ পাওয়া যায়।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মসজিদটি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হলে স্থানীয় একজন ধর্মদরদী ব্যক্তি এটি সংস্কারের উদ্যোগ নেন। সংস্কার কাজের জন্য যখন ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার করা হচ্ছিলো তখন বড় বড় বিষধর সাপ মসজিদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিলো। মসজিদের তৎকালীন ইমাম মাহতাব উদ্দীন পীরসাহেব মসজিদের একটি অংশ ভেঙ্গে দিলে সাপগুলো অন্যত্র চলে যায়। পরে মসজিদটি সংস্কারের পাশাপাশি মসজিদের একটি বারান্দার অংশ বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সরকার এ মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আওতায় নিয়ে আসে। গত কয়েকবছর আগে সরকার থেকে অর্থ বরাদ্দ হয়ে মসজিদ পুনঃসংস্কার করা হয়। বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী এ মসজিদটিতে প্রতিনিয়ত মুসল্লীগণ নামায আদায় করছেন।

শ্বেত ভাল্লুক

সাধারণত ভাল্লুক নানা বন-জঙ্গলে বসবাস করলেও শ্বেত ভাল্লুকের বসবাস মূলতঃ মেরু অঞ্চলের সামুদ্রিক বরফের উপরে। তাদের নিয়ে বিস্ময়কর কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক-

● জীবনের অধিকাংশ সময় সামুদ্রিক বরফে বসবাস করার কারণে শ্বেত ভাল্লুকের খাদ্য, আবাস সবকিছুই বরফের মধ্যে করতে হয়। এজন্য শ্বেত ভাল্লুক 'সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী' হিসেবে পরিচিত।

● বাসস্থান পরিবর্তন করার জন্য এরা বরফে ও বরফ শীতল পানিতে ঘন্টার পর ঘন্টা অনায়াসে সাঁতার কাটতে পারে। সামনের পা দুটো প্যাডলের মতো ব্যবহার করে এরা সাঁতার কাটে।

● শ্বেত ভাল্লুক শিকারে অত্যন্ত অদক্ষ। তাদের সারা দিন কাটে শিকারে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, শিকারের ক্ষেত্রে এদের প্রচেষ্টার মাত্র ২% সফল হয়। পরিশ্রমী এই প্রাণী তবু শিকারের জন্য অবিরত চেষ্টা করতে থাকে।

● শ্বেত ভাল্লুকের পায়ের পাতা এতই পাতলা যে, তাদের পায়ের ছাপ থেকে বিজ্ঞানীরা ডিএনএ সংগ্রহ করে থাকেন।

● মেরু অঞ্চলে ইদানিং ব্যাপক তেল গ্যাস অনুসন্ধান ও কারখানা স্থাপনের কারণে শ্বেত ভাল্লুক এখন বিপন্ন প্রজাতির হয়ে গেছে। কারণ উষ্ণতা তাদের বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট ক্ষতিকর।

● পূর্ণবয়স্ক পুরুষ শ্বেত ভাল্লুকের ওজন প্রায় ৮০০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। স্ত্রী ভাল্লুকের তুলনায় পুরুষ ভাল্লুকের ওজন প্রায় দ্বিগুণ।

● শ্বেত ভাল্লুকের রয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী ঘ্রাণশক্তি। প্রায় দু'কিলোমিটার দূর থেকে এরা শিকারের গন্ধ পেতে পারে।

● বনের মধ্যেও শ্বেত ভাল্লুকের একটি প্রজাতি পাওয়া যায়। এদের সংখ্যা প্রায় ২৬ হাজার বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

সংকলনে: মোহাম্মদ সিদ্দীক হায়দার

বিজ্ঞান

পরওয়ানা ডেস্ক

এক গাছে পাঁচবার ধান

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার হাজীপুর ইউনিয়নের কানিহাটি গ্রামে পাঁচবার ফলন দিবে, এমন একটি নতুন জাতের ধান গাছ উদ্ভাবন করেছেন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ধান গবেষক ও জিনবিজ্ঞানী আবেদ চৌধুরী। নতুন জাতের উদ্ভাবিত এই ধানের নাম তিনি দিয়েছেন 'পঞ্চব্রীহি'।

আবেদ চৌধুরী জানান,বোরো হিসেবে গত বছরের প্রথমে লাগানো এ ধান ১১০ দিন পর পেকেছে। একই গাছে পর্যায়ক্রমে ৪৫ থেকে ৫০ দিন পরপর একবার বোরো,দুইবার আউশ এবং দুইবার আমন ধান পেকেছে। ইতোমধ্যে কৃষকরা এক জমি থেকে পাঁচবার ধান কেটেছেন। তিনি আরও জানান,জমিতে এক গাছে ধানের পাঁচবার ফলনের ঘটনা পৃথিবীতে বিরল। তিনি নতুন জাতের এ ধান সারাদেশে চাষাবাদ সম্ভব কিনা তা যাচাই করবেন। এজন্য বিভিন্ন জেলায় এ ধানের পরীক্ষামূলক চাষ করবেন।

আবেদ চৌধুরীর ভাষ্য,কম সময়ে পাকা এই ধানের উৎপাদন বেশি,খরচও কম। তবে প্রথম ফলনের চেয়ে পরের ফলনগুলোতে উৎপাদন কিছুটা কম। কিন্তু পাঁচবারের ফলন মিলিয়ে উৎপাদন প্রায় পাঁচ গুণ বেশি।

মে মাসের প্রথমদিকে প্রথমবার কাটা ধানে হেক্টরপ্রতি উৎপাদন হয়েছে চার টন। তারপর থেকে ৪৫ দিন অন্তর প্রতিটি মৌসুমে হেক্টরপ্রতি কখনও দুই টন,কখনও তিন টন ফলন এসেছে। সবগুলো জাত হেক্টরপ্রতি প্রায় ১৬ টন ফলন দিয়েছে। ধান গাছের দ্বিতীয় জন্ম নিয়ে ১৪ বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান আবেদ চৌধুরী। ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে কানিহাটি গ্রামে ২৫ বর্গমিটারের একটি ক্ষেতে ২০টি ধানের জাত নিয়ে গবেষণা শুরু করেন তিনি। এর মধ্যে চীন,ফিলিপাইনসহ বিভিন্ন দেশের ও স্থানীয় ধানের জাত ছিল। যে জাতগুলোর ধান পাকার পর কেটে নিয়ে গেলে আবার ধানের শীষ বের হয়,সেগুলো তিনি আলাদা করেন। এভাবে ১২টি জাত বের করেন। তিন বছর ধরে জাতগুলো চাষ করে দেখলেন,নিয়মিতভাবে এগুলো দ্বিতীয়বার ফলন দিচ্ছে। তারপর তিনি শুরু করেন একই গাছে তৃতীয়বার ফলনের গবেষণা। তাতেও সফল হলেন। কিন্তু এর মধ্যে চারটি জাত ছাড়া বাকিগুলো চতুর্থবার ফলন দিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

কানিহাটি গ্রামের আমতলা মাঠে ভিন্ন প্রকৃতির এ ধান গাছ ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যে কৌতুহল তৈরি হয়েছে। বিস্ময়জাগানো এ ধানগাছ দেখতে দূরদুরান্ত থেকে লোকজন কানিহাটি গ্রামে ভীড় করছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন,প্রথমবার ফলন আসার পর পরেরবার ফলন কমতে থাকে। এজন্য এটি খুব একটা লাভজনক নয়। ততদিনে এই ধান কেটে আরেকটি ফসল লাগালে লাভজনক হবে। এক গাছে সর্বোচ্চ দু'বার ফলন হলে ভালো। এ পদ্ধতিতে এখন ফল বাড়াতে আরও গবেষণা করা যেতে পারে।

কুলাউড়ার কানিহাটি গ্রামের সন্তান আবেদ চৌধুরী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা শেষে চাকরি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যান। সেখানকার জাতীয় গবেষণা সংস্থার প্রধান ধানবিজ্ঞানী হিসেবে ২০ বছর ধানের জিন নিয়ে গবেষণা করেছেন। একদল অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানীর সঙ্গে তিনি ফিস (ইন্ডিপেনডেন্ট সিড) জিন আবিস্কার করেন। তিনি লাল রঙের চাল ও রঙিন ভুট্টাও উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর উদ্ভাবিত ডায়াবেটিস ও ক্যান্সার প্রতিরোধক রঙিন ভুট্টা বিশ্বব্যাপী আলোচিত।

কবিতা

গণ-স্বপ্নের বাংলাদেশ
আবদুল মুকীত চৌধুরী

গণ-স্বপ্নের বাস্তবতা বাংলাদেশ
পেরিয়ে যায় অর্ধশত বছরকাল,
পতাকা ও মানচিত্রে স্বপ্নাবেশ—
ত্যাগ-তিতিক্ষার সে কাল কী উত্তাল!

বাংলাদেশের জনগণের সুপ্রভাত—
বজ্রশপথ— শহীদানের জীবনপণ।
'ইন্‌শাল্লাহ্'র অলৌকিকে অন্ত রাত,
বিজয় কড়া নাড়ে দোরে ঝনাৎঝন!

অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান,
মানবিক সে মূল্যবোধের উজ্জীবন;
মহান সব মুক্তিযোদ্ধার জীবন দান—
স্বাধীনতা বাস্তবতায় উত্তরণ।

রক্তক্ষরা অশ্রুঝরা আর সে নয়,
অগণিত দুখীজনের হাসুক মন।
লাল–সবুজের প্রত্যাশিত সূর্যোদয়—
জাতির প্রাণে খুশির বান গায় স্বনন।

বিশ্বমঞ্চে জাগ্রত বাংলাদেশ—
স্বাধীনতা সংরক্ষণে যোদ্ধা-বেশ।

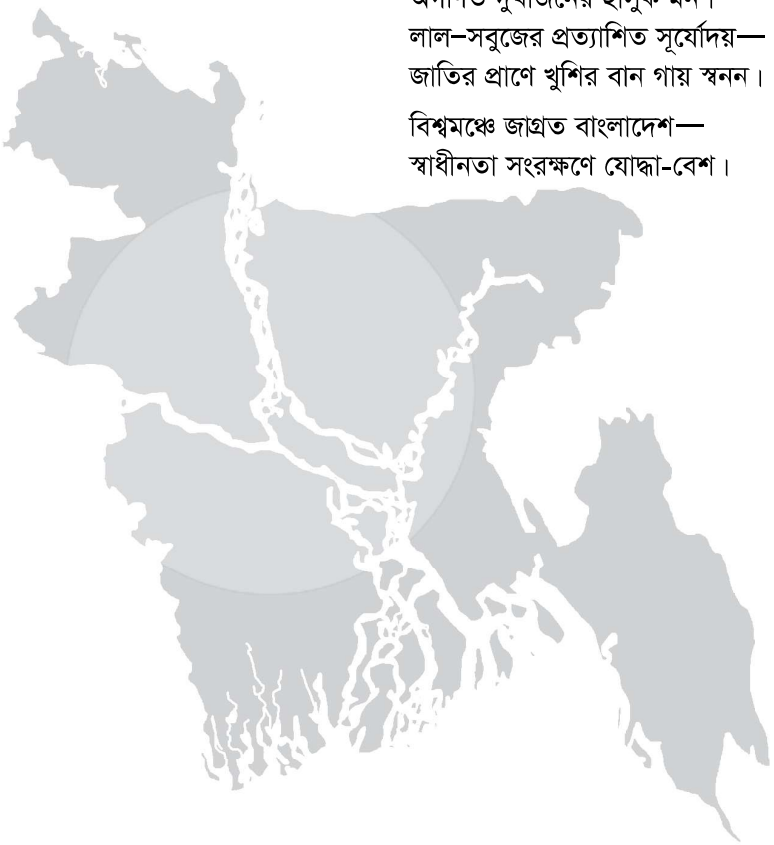

বাংলা আমার স্বপ্ন আমার
ফজল শাহাবুদ্দীন

হাওয়ায় হাওয়ায় কারা কথা বলে কী শুধায়
বাংলাদেশের মানুষেরা সব গেলো কোথায়?

মিছিলে মিছিলে দেখি কতো মুখ কতো যে হাত
অধীর বধির শপথে কঠিন শহরে গ্রামে
বুকের রুধির দিয়েছো যে ঢেলে দেশের নামে–
তবুও কেন যে বাংলাদেশের কাটে না রাত!

বাজারে গঞ্জে নদীতে পাহাড়ে উঠেছে ঝড়
বাংলা আমার স্বপ্ন আমার আমার গান
মায়ের ভাষায় মূর্ত পৃথিবী আমার প্রাণ–
তবুও কেন যে পায় নাকো ভাষা অযুত স্বর।

হাওয়ায় হাওয়ায় মুখরিত কারা কী যে শুধায়
বাংলাদেশের মানুষের সব গেলো কোথায়?

আমার মায়ের অশ্রু ঘুচাতে এমন কেউ
হাজার হাজার লক্ষ কোটিতে বিরামহীন
আত্মবলিতে চেয়েছে বাঁচার নতুন দিন–
তবুও আকাশে নেই কেন সেই পাখির ঢেউ?

আমার মায়ের কণ্ঠ ঘিরে যে করে আঘাত
এরা কারা বলো কথা বলে এরা কোন ভাষায়
মায়ের অশ্রু শুষে শুষে এরা কী সুখ পায়?
জানে না একদা এদের খুনেই হবে প্রপাত।

হাওয়ায় হাওয়ায় কেঁদে ফেরে কী যে শুধায়
বাংলাদেশের মানুষেরা সব গেলো কোথায়?

শুনেছি একদা প্রসারিত মাঠে ছিলো ফসল
সকাল সন্ধ্যা পুষ্পিত সেই বাংলাদেশে–
এখন ক্ষুধার অজগর নাচে যেখানে এসে;
কে মোছাবে বলো আমার দেশের চোখের জল?

আমরা সবাই প্রাণের চেয়েও বাসি যে ভালো
বাংলাদেশের নদী প্রান্তর আকাশ নীল
দোয়েল কোয়েল ফিঙে হরিয়াল পাহাড় ঝিল
সবখানে যেথা একই ধ্বনি শুনি 'রক্ত ঢালো'।

হাওয়ায় হাওয়ায় কারা কথা বলে কী যে শুধায়
বাংলাদেশের মানুষেরা সব গেলো কোথায়?

গল্প

চোর

আজমল খান

সেই শান-শওকত আর নেই তাদের। খাকি শার্ট, খাকি হাফপ্যান্ট, মাথায় টুপি, কোমরে বেল্ট, হাতে মোটা লাঠি-হাঁটবার সময় একেকজনের মনে হতো যেন ব্রিটিশ– ভারতের ছোট লাট। অবশ্য নামে ছোট লাট নয়, চৌকিদার। কিন্তু সেদিন গেছে। এখন সেই ছোট লাটদের মাথায় টুপি নেই, পরনে প্যান্ট নেই, কোমরে বেল্ট নেই। থাকবার মধ্যে আছে বনেদি আমলের সেই খাকি হাফ শার্টটা। তাও জোড়াতালি দেওয়া। কখনো হঠাৎ শার্টের দিকে নযর পড়লে বিগত দিনগুলোর কথা মনে করে তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। শুধু বাইরের লেবাস নয়, তাদের ভেতরটাও পোকায় কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। বেতন পায় না দু তিন মাস। বউ-বাচ্চা নিয়ে একেক জনের বর্ণনাতীত দুঃখ-কষ্ট। জাফর চৌকিদারেরও। জমি-জিরাত নেই তার। একটি গাই আছে। সের দুয়েক দুধ দেয়। দুধ বেচে যা পায় তা দিয়ে কোনোমতে দিন গুযরান হয়। তাই গাইটাকে স্নেহ করে নিজের সন্তানের মতো। মাঝে মাঝে বউকে বলে, গাইডার দিকে একটু নযর রাখিস রাফিয়া।

রাফিয়া বলে, রাখুম।

সেও গাইটাকে জাফরের মতোই ভালোবাসে। সবদিন ভাত রাঁধা হয় না, হলেই চাল ধোয়া পানি আর ফ্যান মিশিয়ে একটা বড় গামলায় করে গাইটার মুখের কাছে ধরে। এতটুকু ফ্যান-পানি! খেতে দেরি হয় না। রাফিয়ার মনে হয়, আরো অনেক খেতে পারত। তার বুকের ভেতরে যন্ত্রণার একটা ঢেউ ওঠে। খড়ও নেই একমুঠো। বড় দুর্দিন যাচ্ছে। নিজেরাও উপোস করে আছে কাল থেকে। রশির বাঁধন কিভাবে যে খুলে ফেলেছিল বাছুরটা! সব দুধ খেয়ে ফেলেছে। রীতিমত খাওয়া-দাওয়া নেই গাইটার। নইলে বিকেলে কিছু দুধ পাওয়া যেত। রাফিয়া বাঁশপাতা, এটা ওটা এনে দেয় গাইটাকে, কিন্তু তাতে এতবড় জিনিসটার পেট ভরে না কিছুতেই।

রাফিয়া বলে, একটা কাজ কর।

-কী?

-বিকেলে তো তোমার কাজ নেই। মাঠ থাইক্যা কিছু ঘাস কাইট্যা আন। গাইডারে খাওয়াও। ওডা না খাইলে আমরাই বা খামু কী?

কথাটা মন্দ নয়। জাফর একটি চটের ছালা ও কাঁচি নিয়ে ঘাসের খোঁজে মাঠের দিকে রওয়ানা হয়। কিন্তু কাজটা যত সহজ সে মনে করেছিল, ক্ষেতের আলে ঘুরে ঘুরে তার মনে হলো, তত সহজ নয়। সারা মাঠে ধান, শীষ বেরুচ্ছে। আলের ঘাস আগেই কারা পরিষ্কার করে ফেলেছে। কিছু কিছু যা আছে, ঘাস কাটতে গেলে ধানের চারাও কিছু কাটতে হয়। কাঁচি চালাতে গিয়ে জাফরের হাত থেমে যায়। সে চৌকিদার। মানুষের জান-মালের হিফাযত করে সে। কাটবে কী করে ঘাসের নাম দিয়ে ধানের চারা। জাফর উঠে দাঁড়ায়। ক্ষেতের আল ধরে হাঁটতে হাঁটতে জাফর তার বউ, বাচ্চা আর গাইটার উপবাসী মুখ দেখে। গাইটার পেট ভরিয়ে না রাখলে তাদের উপবাস ঘুচবে না। তার মুক্তবুদ্ধি সহসা আবার গুলিয়ে যায়। সে একটি ক্ষেতের আলে বসে পড়ে ঘাস কাটবার জন্য। দ্রুত হাত চালায় জাফর আর মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখে, কেউ এল কিনা। আবার উঁকি দিয়েই সে চটের ছালা আর কাঁচিটা ধান ক্ষেতের ভেতরে লুকিয়ে ফেলে। কে একজন আসছে এদিকে। সে মাথা নুইয়ে নুইয়ে দুটো জমি পার হয়ে যায়। তারপর উঠে দাঁড়ায়।

জাফর না? একজন বয়স্ক লোক সে যে জমিটার আলের ঘাস কাটছিল সেখান থেকে জিজ্ঞেস করে।

হ মামু।

নিজের জমির আলের দিকে চেয়ে লোকটি ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, শালাদের কান্ড দেখছো জাফর!

কী?

জাফর এগোয় লোকটির দিকে। আর কডা দিন পরে ধানডা কাটা যাইত। এই ধানডাই শালারা কাইটা নিতেছে।

জাফর দুঃখ করে, এই দেশে কিছু অইত না মামু। নিজের খায়নও চিনে না! এত উপবাস থাইকাও ওদের শিক্ষা অইল না!

লোকটি কথা বলে না। তেমনি ক্রুদ্ধ চোখে আল-পথ ধরে হাঁটতে থাকে।

...

বোঝাটা মাথা থেকে উঠোনে নামিয়ে রেখে জাফর হাঁক দেয়, রাফিয়া!

রাফিয়া বাচ্চা কোলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। জাফর বলে, আর ঘাস কাটতে যামু না।

যাইবা না কেরে? না, যাব না। লোকজন গালাগালি করে।

এক মুঠো ঘাস হাতে নিয়ে জাফর গোয়ালঘরের দিকে এগোয়, ঘাসের সাথে দুই একটা ধান আছে।

গোয়ালে ঢুকে গাইটা দেখতে না পেয়ে জাফর বলে, গাইটা কই?

রাফিয়া উঠোনে দাঁড়িয়েই বলে, ঘরে নাই?

না।

রশি ছিঁড়া পালাইছে না তো?

গাইয়ের রশিটা হাতে নিয়ে জাফর দেখে। বলে, হ রশি ছিঁড়া পালাইছে।

গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে আসে সে। তার মুখটা বিমর্ষ। ক্লান্তি তার সারা শরীর ঘিরে। খাওয়া-দাওয়া নেই। এরপর সারারাত চলবে পাহারা। তার উপর এইসব ঝুট-ঝামেলা ভালো লাগে না তার। এখন গাইটা খুঁজতে কত জায়গায় যে যেতে হবে তাকে।

রাফিয়া বলে, তুমি বাচ্চাডারে দেইখো। আমি গাইডা খুঁইজা দেখি।

না।

না করছ কেরে?

জাফর কথা বলে না। ঘরের দিকে পা বাড়ায়। রাফিয়া তার পেছনে এগোয়।

বাইরে যাইতে 'না' করছ কেরে? রাফিয়া আবার কথাটা উচ্চারণ করে। জাফর বউয়ের চোখের দিকে তাকায়, তোরে আমি বাইরে পাডাইছি কোনোদিন? রাফিয়া চোখ নামায়, না।

তাইলে তুই ঘরে বইয়া থাক। গাই নিজে নিজেই আইব। আর না আইলে আমি নিজেই যামু গাই খুঁজতে।

পারবা তুমি? না খাইয়া অত কাম করছো, তার উপর আবার গাই খুঁজতে পারবা?

তুই খাইছিস?

রাফিয়া চমকে উঠে তার কথায়। দৃষ্টি নামিয়ে নীরব থাকে। তার কথাও মনে রাখে লোকটা।

জাফর বলে, তুই না খাইয়া পারলে আমি পারতাম না কেরে? আর তোরে আমি বাইরে যাইতে দিতাম না।

...

গাই খুঁজতে বেরোয় জাফর। পথে একজনের সাথে দেখা।

মামু, আমার গাইডা দেখছ?

না তো।

জাফর হাঁটতে থাকে। কিন্তু সে এত ক্লান্ত যে, তার পা কোথায় পড়ছে ঠিক বুঝতে পারে না। দিনের আলো নিভে আসছে। দ্রুত পা চালায় জাফর। হঠাৎ মৃধা বাড়িতে একজনকে ঢুকতে দেখে সে ডাকে চিনু না?

হ চাচা।

আমার গাইডা দেখছ বাজান?

না।

জাফর আবার হাঁটতে থাকে। মাঠটা একবার ঘুরে আসা দরকার। সেখানে না পেলে লোকের বাড়ি ঘুরে দেখতে হবে। সেখানেও না পেলে খোঁয়াড়ে যেতে হবে। খোঁয়াড়ের কথা মনে হতেই জাফরের ক্লান্তি আরও বেড়ে যায়। কয়েকবারই খোঁয়াড় থেকে ছাড়িয়ে আনতে হয়েছে গাইটাকে। তাও বিনা পয়সায় বারবার খাতির করবে না খোঁয়াড়ওয়ালা।

রাফিয়া বাইরে এসে দাঁড়ায়। রাত অনেক হয়ে গেছে। চারিদিক আঁধারে ছেয়ে আছে। এসময় একা বাইরে থাকতে তাঁর খুব ভয় করে। তবু সে দাঁড়িয়ে থাকে বাইরে। এখনও ফিরল না জাফর। গাইটা কি খুঁজে পায়নি? নাকি গাইটা খুঁজে না পেয়ে রাতের পাহারায় চলে গেছে? বাচ্চাটা বড় কাঁদছে। গাইটা এলে এক আধটু দুধ দুইয়ে খাওয়ানো যেত বাচ্চাটাকে।

ঘরে এসে সে দরজাটা আটকায়। জাফর বোধ হয় এখন আর আসবে না। ডিউটিতে চলে গেছে। সারারাত চলবে তার পাহারা। দু'একবার এসে রাফিয়ার খোঁজ নেবে। তারপর আবার লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে পাহারা দেবে। পরের নিরাপত্তার ভার তার উপর। কিন্তু তার দুটো ভাতও খেতে পায় না। চোর ধরতে গিয়ে দু'তিনবার আহত হয়েছে সে। একবার এক চোর ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল তার পেটে। ভাগ্য ভালে যে ছুরিটা ঠিক তার পেটে বসেনি, ফসকে গিয়েছিল। যার জন্য তার পেটের চামড়া কিছুটা কেটে গিয়েই নিস্তার পায় সে।

এ মুহূর্তে গাইটার কথা আর মনে হয় না রাফিয়ার। মনে হয়, ভালোবাসায় ভরা একটি মুখের কথা। যে মুখ হারিয়ে গেলে তার বেঁচে থাকার কোনো অর্থই থাকবে না। তার ভেতরটা কেমন করতে থাকে। এ সময় তার আরেকজনের কথা মনে হয়। তিনি তার প্রতিপালক। তার আজীবনের বিশ্বাস, তিনি তাকে খাওয়ান, পরান, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। তাই তার আর্তি তার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে, হাত তুলে পরওয়ার দিগারের দরবারে। ইয়া আল্লাহ! তুমি সব বালা-মুসিবত থাইকা আমার মানুষটাকে বাঁচাইয়া রাইখো।

(২)

চোরটাকে পেছন থেকে জাপটে ধরে লোকটা চেঁচাতে থাকে, চোর চোর...

হঠাৎ আক্রমণে চোরটা হতভম্ব হয়ে যায়। তারপর পেছনে তাকিয়ে লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করে। কিন্তু লোকটা এমনভাবে তাকে জাপটে ধরেছে যে ভালো করে সে মুখই ফেরাতে পারে না।

এখন কৃষ্ণপক্ষ। ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারিদিকে সীমাহীন নীরবতা। চাঁদ উঠবে আরও একটু পরে। অন্ধকার গাঢ় হওয়াতে চোরটা আশ্বস্ত হয়। বাতি নিয়ে লোকজন আসবার আগে অথবা চাঁদ উঠবার আগে যেভাবেই হোক তাকে লোকটার হাত থেকে পালাতে হবে, যেভাবেই হোক।

চোরটা তার গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে এবার চেষ্টা চালায়। কিন্তু প্রতিপক্ষ এত শক্তিশালী যে সে কিছুতেই তার হাত ছাড়াতে পারে না। হৈ চৈ শুনে পাড়ার লোকজন দৌড়ে আসে। লোকটার কণ্ঠস্বর শুনে তারা চোরের অবস্থান বুঝে নিয়ে এলোপাথাড়ি মার চালায় চোরের উপর। কিছুক্ষণের মধ্যে নিস্তেজ হয়ে পড়ে চোরটা। ছাড়া পাবার চেষ্টা বাদ দেয় সে। আত্মসমর্পণের ভাব এখন তার।

কিন্তু তাতেও তার কোনো লাভ হয় না। কিল, ঘুষি, লাথি, লাঠির বাড়ি চলে সমানে। চোরটা লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

বাতি, বাতি বলে চেঁচাতে থাকে লোকজন।

চোরটাকে চেনবার লোভ সবার মনে। প্রথমে একটি লণ্ঠন নিয়ে আসে একজন। তারপর আসে আরও অনেকে। কে একজন একটি বাতি চোরের মুখের কাছে নিয়েই চমকে ওঠে, এ্যাঁ।

হারু খোঁয়াড়ওয়ালা চট করে তার খোঁয়াড়টার দিকে তাকায়। জাফর চৌকিদারের গাইটা বাঁধা আছে খোঁয়াড়ের ঠিক দরজার কাছে। গাইটা চেয়ে আছে এদিকে। অনেকগুলো বাতির আলোয় এখন জায়গাটার অন্ধকার ঘুচে গেছে। আলোর কিছুটা অংশ পড়েছে খোঁয়াড়ের মুখে।

গাইটার মুখ আধো আলোয় আধো অন্ধকারে। গাইটার মুখের আলোকিত অংশের দিকে তাকিয়ে হারুর মনে হয়, এর চোখ দুটি যেন জ্বলজ্বল করছে। কাছেই একটি খড়ের গাদা। হারু খোঁয়াড়ওয়ালা ঠিক বুঝতে পারে না, কেন এর চোখগুলো জ্বলছে। খাবারের লোভে, নাকি তার মনিব জাফর চৌকিদারের জন্যে- যে তাকে চুরি করে খোঁয়াড় থেকে ছাড়িয়ে নিতে এসে ধরা পড়েছে এবং বেদম মার খেয়ে এখন অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে।

হারুর দৃষ্টি ঘুরে গিয়ে জাফরের উপর পড়ে। যেন ঘুমিয়ে আছে জাফর। একটি অবুঝ শিশুর মতন। যার দুঃখ নেই, অভাব নেই, অভিযোগ নেই। জাফরের সব কথা হারু জানত। এখন এসব মনে করে তার ভেতরটা বড় কাঁদতে থাকে। হু হু করে কাঁদবার ইচ্ছেও হয় তার। কিন্তু এখানে এখন অনেক লোকের ভীড়। তাই কাঁদবার যো নেই। আর এজন্য হারুর মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে ওঠে। একজনের কাছ থেকে একটি লাঠি নিয়ে পাগলের মতো সে এলোপাথাড়ি লাঠি চালায় জনতার উপর, এই শালারা, ভাগ।

বিজয় মানে
তালহা শফিক

বিজয় মানে আকাশ নীলে
প্রভাত পাখির গান
অমর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা
রাখলো দেশের মান।

বিজয় মানে চাঁদের আলো
মায়ের হাসি মুখ
বোনের কাজল বাবার চোখে
স্বাধীন দেশের সুখ।

বিজয় মানে বীর বাঙালির
ধনুক ভাঙা পণ
পাক সেনাদের বন্দি করে
থামলো শেষে রণ।

বিজয় মানে নতুন সূর্য
লাল সবুজের গান
বিজয় মানে লাখো শহীদের
স্মৃতি অম্লান।

বিজয় মানে সোনার বাংলা
স্বপ্ন পূরণ দিন
লক্ষ তাজা প্রাণের কাছে
আছে অনেক ঋণ।

বিজয় দিবস
ইয়াহইয়া আহমদ চৌধুরী

লক্ষ শহীদ রক্ত দিয়ে
করলো স্বাধীন দেশ
মা মাটি আর মাতৃভূমি
প্রাণের বাংলাদেশ।

লাখো শহীদের রক্তে কেনা
প্রিয় মাতৃভূমি
যারা ছিলেন দেশের তরে
অধিক অনুগামী।

বিজয় দিনে করছি স্মরণ
যাদের অবদান
পরপারে সুখে থাকুক
সকল শহীদান।

বিজয়ের মাস
লিমান হোসাইন

বাংলা আমার আবাসভূমি
বাংলা ভালোবাসি
বাংলা আমার কাস্তে হাতে
কৃষক মুখে হাসি।

দেশটা আমার রবের দেওয়া
করা পরিপাটি
রত্ন ভান্ডার বহন করে
আমার দেশের মাটি।

বাংলা আমার খোদার দেওয়া
মহান এমন দান
লাখ শহীদের খুনের স্রোতে
অর্জিত তার মান।

তাদের রক্তে জন্ম নিলো
বাংলা নামক দেশ
একাত্তরের নবম মাসে
কাটলো সবার ক্লেশ।

যুদ্ধে যাবার পালা
রেদ্বওয়ান মাহমুদ

রাতে হঠাৎ দূর গাঁ থেকে শব্দ এলো ‘গুলি’
বাড়লো ভীতি কখন কী হয় কোথায় যাবে তুলি।
মুখটা মলিন বাবা-মায়ের কান্না চোখে জমা
‘এখন যে কী হবে, এবার কোথায় যাবো ওমা’?

চিন্তা যেন বাড়লো দ্বিগুন মেয়ের কথা শুনে
হতাশ বাবা, উত্তরও তো পাচ্ছেনা ঠিক গুনে।
একটাই মেয়ে তুলি যে তার বয়স কেবল বারো
পাক’রা নাকি নিচ্ছে তুলে এই বয়সী আরো।

নিজের থেকে চিন্তা এখন বেশিই মেয়ের তরে
নেই ভরসা, আর যাবেনা থাকাটা এই ঘরে।
খবর এলো- পাক সেনারা পাড়ায় গেছে ঢুকে
যার যা আছে বেরিয়ে পড়ো এবার দেবো রুখে।

অচেনা এক কণ্ঠে বাবা বলছে- মেয়ে শোনো
বেঁচে ফেরার নেইতো মোটে নিশ্চয়তা কোনো।
আর দেরী নয় এবার এলো যুদ্ধে যাবার পালা
মা আর মেয়ে থাকবে তবে ঝুলবে ঘরে তালা।

ঘরের কোণে বন্দি থেকো হওনা যেন বের
পাক’রা এলে ফিরে যাবে কেউ পাবেনা টের।
আবার যদি বেঁচে ফিরি তবেই হবে দেখা
যাচ্ছি আমি, সাহস রেখো, তোমরা কি আর একা!

আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে মা কান্না করেন জোরে
বিদায় দিতে তুলি এবার বাবার বাহুডোরে।

আল আমিন
নাহিদা জান্নাত মাছুমা

সমাজ থেকে নৈতিকতা যখন গেলো উড়ে
অত্যাচার আর অন্ধকার বসল যখন ঘিরে।
ঠিক সে সময়ে এলেন যিনি নবী দুজাহান
তাঁর ছোঁয়াতে বঞ্চিত সব পেল পরিত্রাণ।
যে সময়ে মিথ্যা ছিলো সঙ্গী প্রতিদিন
তবুও তিনি সবার কাছে ছিলেন আল আমিন।

আন্দালিব ভাই সমীপে...

প্রিয় আন্দালিব ভাই!
কুর্নিশ গ্রহিবেন। আশা করছি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমি সত্যিই প্রীত! গত পরওয়ানায় আপন-রচিত 'আগমন'– শিরোনামের গাথা অবলোকন করে সত্যিই মনের সুখ-অবয়ব মেলেছিলাম! ক্ষুদ্র এই মানবের লেখনীটা আপনারা পরওয়ানার পাতায় ঠাঁই দিয়েছেন, কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি আপনার এবং পরওয়ানায় কর্মরত সকলের প্রতি। সেই সাথে প্রার্থনা করছি,পরওয়ানার অগ্রযাত্রা নবীনদের ছোঁয়ায় সৌম্য হয়ে উঠুক! হরিৎ লেগে থাকুক প্রতি-পাঠকের হৃদে! হিয়ার ভালোবাসার পাতায় অনুবিদ্ধ হোক নব এক নাম-'পরওয়ানা'!

মোহাম্মদ ইউসুফ আহমদ সাঈম
সোবহানীঘাট, সিলেট

-আন্দালিব ভাই: তোমার দুআয় আমরা সবাই ভালো আছি, সুস্থ আছি। তোমার লেখা ছাপা হওয়ায় তোমার আনন্দের সাথে আমরাও আনন্দিত হলাম। পরওয়ানা তোমার হৃদয়ে অনুরণন সৃষ্টি করতে পেরেছে তা পরওয়ানার পাঠকপ্রিয়তার একটি অংশ। তোমাদের মতো উদিয়মান তরুন লেখক তৈরি করাই পরওয়ানার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তুমি লিখে যাও নিয়মিত। তোমার বন্ধুদেরও লিখতে উদ্বুদ্ধ করবে। তোমাদের দ্বারা তৈরি হবে আগামী দিনের একঝাঁক কলমসৈনিক। যারা সমাজের সব অসুন্দরকে করবে সুন্দর, অন্ধকারে জ্বালবে আলোর দ্বীপশিখা,কুসংস্কার দূর করে একটি সোনালী সমাজ গড়বে এই প্রত্যাশা করছি।

প্রিয় আন্দালিব ভাই!
পরওয়ানা পরিবাররের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের সমাহার নিয়ে পুরো বছরজুড়ে আমাদের সাথে ছিল প্রিয় ম্যাগাজিন মাসিক পরওয়ানা। সমসাময়িক বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনাসহ অনেক অজানাকে জানতে পেরেছি,শিখতে পেরেছি পরওয়ানার মাধ্যমে। যারা এতো শ্রম ও লেখা দিয়ে আমাদের আনন্দ ও জ্ঞান আহরণের সুযোগ করে দিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের জন্য ভালোবাসার পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা রইলো।

মো. মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী
কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার

সদস্য কুপন

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি 'আবাবীল ফৌজ' এর সদস্য হতে চাই। আমার বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেকে সচেষ্ট রাখবো।

নাম: ----------
পিতা/অভিভাবক: ----------
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ---------- শ্রেণি: ----------
গ্রাম: ---------- ডাক: ----------
থানা: ---------- জেলা: ----------

কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠিয়ে দাও।

আন্দালিব ভাই
পরিচালক, আবাবীল ফৌজ
মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট সিলেট-৩১০০
Mobile: 01799 629090, E-mail: parwanaafbd@gmail.com

-আন্দালিব ভাই: তোমার সুন্দর অনুভূতির জন্য অনেক ধন্যবাদ। গত বছরজুড়ে তোমার সরব উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তোমার অংশগ্রহণে আবাবীল ফৌজ ছিল প্রাণবন্ত। সময়ে সময়ে তোমার বিভিন্ন লেখাসহ আবাবীল ফৌজের বর্ণকল্প, শব্দকল্প ও বলতো দেখিতে ছিলে তুমি নিয়মিত। তোমার পাঠানো আন্দালিব ভাই সমীপের চিঠি পেয়েছি নিয়মিত। তোমার এই তৎপরতার জন্য আন্দালিব ভাইয়ের পক্ষ থেকে তোমাকে মুবারকবাদ। তোমার লেখালেখি যেন অব্যাহত থাকে সবসময়। তোমার জীবনের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

প্রিয় আন্দালিব ভাই!
মাসিক পরওয়ানা বাংলাদেশের জনপ্রিয় একটি মাসিক পত্রিকা। পরওয়ানা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। অনেক অজানাকে জানতে পারি পরওয়ানা পাঠের মাধ্যমে। বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের লেখাগুলো আমাদের জ্ঞানচর্চার এক অনন্য মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

প্রথিতযশা সম্পাদক মহোদয়ের সুদক্ষ সম্পাদনায় সমৃদ্ধ ম্যাগাজিনটি নিয়মিত পৌঁছে যাচ্ছে পাঠকের হাতে হাতে। দক্ষ সম্পাদনার মাধ্যমে প্রকাশিত প্রিয় পরওয়ানা আজ সর্বশ্রেণির পাঠকের কাছে সমাদৃত ও প্রশংসিত।

নভেম্বর তথা ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ সংখ্যা অনেক ভালো লেগেছে। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুবারক স্মৃতিচিহ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সংযোজন হয়েছে। যার জন্য পরওয়ানা পরিবারকে আন্তরিক মুবারকবাদ। পরওয়ানা হোক সকল পাঠকের জ্ঞানের আকর। বিশুদ্ধ আকীদা পৌঁছে যাক পরওয়ানার মধদিয়ে সর্বত্র। সকল পাঠকের জন্য রইলো শুভকামনা।

জুবায়ের আহমদ সুমন
লক্ষনাবন্দ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

-আন্দালিব ভাই: পরওয়ানা অজানাকে জানার মাধ্যম হিসেবে সমাদৃত হতে পেরেছে জেনে খুশি হলাম। ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ সংখ্যা তোমাদের ভালো লেগেছে জেনে আমরাও আনন্দিত। এ সংখ্যার ব্যতিক্রমী সংযোজন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্মৃতিচিহ্ন। যা তোমার মতো অনেকের কাছে ছিল আকর্ষণের বিষয়। পরওয়ানা হোক অনুসন্ধানী পাঠকের প্রিয় ম্যাগাজিন। পরওয়ানার সাথে তোমাদের বন্ধন হোক আরও সুদৃঢ়। পরওয়ানার পথচলায় সকলের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আরও বেগবান হোক। সকলের জন্য শুভকামনা।

প্রিয় আন্দালিব ভাই!
আশা করি ভালো আছেন। আমি আবাবীল ফৌজের একজন নিয়মিত পাঠক। ফৌজের গল্পগুলো আমার খুব ভালো লাগে। আমিও এই বিভাগে 'ইমাম আবু হানীফা সিরিজ' নামে ধারাবাহিক কয়েকমাস গল্প লিখতে চাই। আমার লেখাগুলো কি ছাপা হবে?

মাহফুজুর রহমান
বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ,সিলেট

আন্দালিব ভাই, আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। আবাবীল ফৌজের নিয়মিত পাঠক হিসেবে তোমাকে শুভেচ্ছা জানাই। ফৌজের গল্পগুলো তোমার ভালো লাগে শুনে খুশি হলাম। তুমি 'ইমাম আবু হানীফা সিরিজ' নামে ধারাবাহিক গল্প লিখতে চাও জেনে প্রীত হলাম। তোমার লেখাগুলো দ্রুত পাঠিয়ে দাও আবাবীল ফৌজে। মনোনীত হলে অবশ্যই ছাপা হবে। মনে রাখবে আবাবীলে লেখা পাঠানোর জন্য সতন্ত্র ই-মেইল রয়েছে। অবশ্যই আবাবীলের নির্ধারিত ই-মেইলে লেখা পাঠাতে হবে। চিঠির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

আন্দালিব ভাইয়ের চিঠি

আসসালামু আলাইকুম

চলছে বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দিনটি ছিল বাঙালির বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনার ফল। ৭ কোটি বাঙালির মহা উৎসবের দিন ছিল সেটি। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দুঃসহ স্মৃতি, স্বজন হারানোর বেদনা, সবকিছু ভুলে দলে দলে মানুষ নেমে এসেছিল রাজপথে। সবার হাতে ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা। দুর্বিষহ অতীতকে ভুলে মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল সম্ভাবনাময় আগামীর বাংলাদেশের। দেশ স্বাধীনের আজ প্রায় অর্ধশতাব্দিকাল চলছে। এর ভেতর ক্ষমতার পালা বদল হয়েছে অনেকেরই। গদির পালা বদল হলেও আম জনতার ভাগ্যের বিশেষ কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করলেও নাগরিক জীবনে সুবর্ণ অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি এখনও। অন্যায় অবিচার ও শোষণমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যেই আমরা বিজয়ার্জন করেছি-লাম। বিজয়ের দিনে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপনের পাশাপাশি এই ভূ-খণ্ডের সুরক্ষা, উন্নয়ন ও অগ্রগতি দ্বারা দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য আমাদের কাজ করে যেতে হবে। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও সুন্দর সোনার বাংলা গড়তে তোমাদের এগিয়ে আসতে হবে সর্বাগ্রে। মেধা, মনন ও নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তোমাদের তৈরি হতে হবে।

বন্ধুরা! তোমাদের জন্য একটি সুখবর নিয়ে হাযির হচ্ছি আমরা। আবাবীল ফৌজের বন্ধুদের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তৈরি হচ্ছে পরওয়ানা ফাউন্ডেশন। শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়তাসহ বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে এ ফাউন্ডেশন। তোমাদের মধ্যে যে মেধাবী বন্ধুদের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে, তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে পাঠাও আমাদের কাছে। পরওয়ানা তাদের পাশে দাঁড়াবে সাধ্যানুযায়ী।

প্রিয় বন্ধুরা! পরওয়ানা নতুন উদ্যমে প্রকাশের এক বছর পূর্ণ হলো এই ডিসেম্বরে। বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তোমাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। পুরো এক বছর তোমরা পরওয়ানার সাথে যে হৃদ্যতার বন্ধনে ছিলে সে বন্ধন যেন অটুট থাকে সবসময়। ২০২২ সালের পরওয়ানায় তোমাদের অংশগ্রহণ যেন হয় আরও প্রাণবন্ত। আবাবীল ফৌজ যেন সাজে তোমাদেরই চাওয়া পাওয়ার প্রেক্ষিতে। তোমরা পড়বে, লিখবে, অভিব্যক্তি জানাবে। তোমাদের নতুন বন্ধুদের ফৌজের সদস্য বানাবে। লিখতে উদ্বুদ্ধ করবে।

এ মাসেই আমরা বিদায় জানাচ্ছি ২০২১ সালকে। আমাদের জীবনে যোগ হলো নতুন আরও একটি বছর। ২০২২ সালকে বরণ করবো আমরা কয়েকদিন পরেই। তবে তা যেন হয় ইতিবাচক কার্যক্রম করার পরিকল্পনার মধ্যদিয়ে। বর্ষবরণের সকল প্রকার অনৈসলামিক কার্যকলাপকে না বলার স্লোগানে বরণ করবো নতুন বছরকে। আগামী বছর সবার জন্য হোক মঙ্গলময়, সেই প্রত্যাশায় বিদায় নিলাম।

ইতি

তোমাদেরই আন্দালিব ভাই

বলতো দেখি?

এ সংখ্যার প্রশ্ন

১. আশআতুল লুমআত এর রচয়িতা কে?
২. মূল বক্তব্যের আগে রাসূল (সা.) এর দেওয়া বিশেষ খুতবার নাম কী?
৩. মাসিক পরওয়ানা কত সাল থেকে শুরু হয়?
৪. করোনার চিকিৎসায় প্রথম অ্যান্টিভাইরাস ট্যাবলেটের নাম কী?
৫. কিমিয়ায়ে সাআদাত এর রচয়িতা কে?

গত সংখ্যার উত্তর

১. ইবরাহীম রাইসী
২. আরাকান
৩. ১৫৫৬ সালে
৪. ১৪ শাওয়াল, ১৭০৪ ঈসায়ী
৫. গাউসুল আযম আব্দুল কাদির জিলানী

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে [প্রথম তিনজন পুরস্কৃত]

হুমায়রা হোসেন সুমাইয়া, জাহানারা চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষিপাশা, চরমহল্লা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মো. শাহজাহান আলম, আমতৈল, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # সাজ্জাদুর রহমান, টেক কামালপুর, বিশ্বনাথ, সিলেট # সাবিনা আক্তার ফাহমিদা, লতিফিয়া ইসলামিক আইডিয়াল একাডেমি, আটগ্রাম, জকিগঞ্জ, সিলেট # সাহেরা আক্তার মুক্তা, এসপিপিএম আদর্শ দাখিল মাদরাসা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # সুলতান আল বাছিত, লতিফিয়া ইসলামিক আইডিয়াল একাডেমি, আটগ্রাম, জকিগঞ্জ, সিলেট # শরিফ আহমদ, সৎপুর কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # মো. রইছ উদ্দিন, পুরান পারকুল, কালারুকা, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট # নাহিদা জান্নাত মাসুমা, তৈয়বুন্নেছা খানম সরকারি কলেজ, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মো. ছাদিকুর রহমান, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # হাফিজ মিজানুর রহমান, গজনাইপুর, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, গাজীপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # রাজনুর খাঁন, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # ওমর আহমেদ চৌধুরী, লতিফিয়া ইসলামিক আইডিয়াল একাডেমি, আটগ্রাম, জকিগঞ্জ, সিলেট # হুসাইন আহমদ, রাখালগঞ্জ দারুল কোরআন ফাজিল মাদরাসা, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # মো. জাবেল আহমদ, দক্ষিণ ভবানীপুর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মো. রেদওয়ানুল হক সোহাগ, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মো. আবু সুফিয়ান সাদি, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # আহমদ হোসেন তামীম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মোছা. ফারিয়া আক্তার জয়া, সরকারি জিল্লুর রহমান মহিলা কলেজ, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ # মো. মাজিদুর রহমান, তেতই গাঁও রশিদ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # মো. নিজামুল হক সোহাগ, লতিফিয়া হিফযুল কুরআন সেন্টার, সোবহানীঘাট, সিলেট।

শব্দকল্প

১		■	২	■	৩
■	■	৪			
৫				■	
■	■		■	৬	■
৭			■	৮	৯
১০		■	১১		

সূত্র : পাশাপাশি

১। জননী, মা ৪। অভ্যর্থনা জানানোর আরবী পরিভাষা ৫। আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ৭। ডুপ্লিকেট, প্রতিলিপি ৮। মরুভূমির জাহাজ ১০। শক্তি, সামর্থ্য ১১। একটি দেশের রাজধানী

সূত্র : উপর-নীচ

২। কোমল ৩। পেন্সিলের কালি মোছার উপকরণ ৪। আসবাবপত্র ৬। একটি দেশের মুদ্রার নাম ৭। নতুন, নয়া ৯। ১০০০ কিলোগ্রাম

গত সংখ্যার সমাধান

ম	দী	না	■	কা	বা
ক্কা	■	মা	দ	রা	সা
■	■	য	■	মা	■
■	চা	■	স	ত	র
আ	মে	রি	কা	■	জ
■	লি	■	ল	ক	ব

গত সংখ্যার শব্দকল্পের পরিকল্পনাকারী

বদরুল ইসলাম

নোয়াগাঁও, দনারাম, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট

শব্দকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে (প্রথম তিনজন পুরস্কৃত)

শরিফ আহমদ, সৎপুর কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # সাদিয়া আক্তার (ঝুমা), মাইজপাড়া দাখিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # মোছা. ফারিয়া আক্তার জয়া, সরকারি জিল্লুর রহমান মহিলা কলেজ, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ # রাজনুর খাঁন, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # শাহরিণ আক্তার, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মরিয়ম আক্তার (রুমি), ইয়াকুব টাওয়ার, লতিফিয়া আবাসিক এলাকা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মহসিনা জান্নাত তাহেরা (আবিদা), ইয়াকুব টাওয়ার, লতিফিয়া আবাসিক এলাকা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মো. হাবিবুর রহমান, রসুলপুর জামেয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা, চিলাউড়া, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ # সাহেরা আক্তার মুক্তা, এসপিপিএম আদর্শ দাখিল মাদরাসা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মো. রইছ উদ্দিন, পুরান পারকুল, কালারুকা, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট # রায়হান হোসেন, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # কামরুল ইসলাম, নালবহর, বিয়ানীবাজার, সিলেট # মো. মাজিদুর রহমান, তেতইগাঁও রশিদ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, কামলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # শেখ সাব্বির আহমদ, প্রচার সম্পাদক, বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া, নবীগঞ্জ উপজেলা, হবিগঞ্জ # মহরম আলী, চিতলিয়া, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # মো. রেদওয়ানুল হক সোহাগ, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মো. আবু সুফিয়ান সাদি, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # আহমদ হোসেন তামীম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মো. জাবেল আহমদ, দক্ষিণ ভবানীপুর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # সুলতান আল বাছিত, লতিফিয়া ইসলামিক আইডিয়াল একাডেমি, আটগ্রাম, জকিগঞ্জ, সিলেট # মো. নিজামুল হক সোহাগ, লতিফিয়া হিফযুল কুরআন সেন্টার, সোবহানীঘাট, সিলেট # মরিয়ম আক্তার, কামালপুর হাফিজিয়া ইবতেদায়ী মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # মো. ছিদ্দিকুর রহমান, কামালপুর হাফিজিয়া ইবতেদায়ী মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # নাহিদা জান্নাত মাসুমা, তৈয়বুন্নেছা খানম সরকারি কলেজ, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মো. ছাদিকুর রহমান, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # হাফিজ মিজানুর রহমান, সভাপতি, গজনাইপুর, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

বর্ণকল্প

এ সংখ্যার বর্ণকল্প

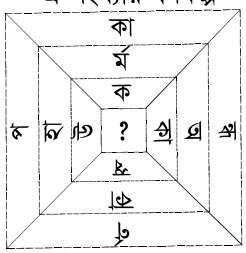

বর্ণগুলো এলোমেলো আছে। এগুলো সাজিয়ে কেন্দ্রের ফাঁকা ঘরে একটি মাত্র বর্ণ বসালে চারটি অর্থবোধক শব্দ তৈরি হবে। চেষ্টা করে দেখতো অর্থসহ শব্দ চারটি তৈরি করতে পারো কি না! সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।

গত সংখ্যার সংখ্যাকল্পের সমাধান

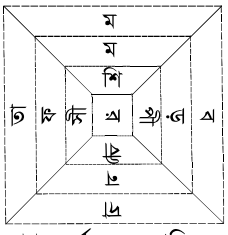

গত সংখ্যার বর্ণকল্পের পরিকল্পনাকারী

মহরম আলী

চিতলিয়া, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে

ওসামা আহমদ চৌধুরী, লতিফিয়া ইসলামিক আইডিয়াল একাডেমি, আটগ্রাম, জকিগঞ্জ, সিলেট # সাবিনা আক্তার ফাহমিদা, লতিফিয়া ইসলামিক আইডিয়াল একাডেমি, আটগ্রাম, জকিগঞ্জ, সিলেট # হুমায়রা হোসেন সুমাইয়া, জাহানারা চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষিপাশা, চরমহল্লা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মোছা. সিমা রহমান, চাঁন্দভরাং, বিশ্বনাথ, সিলেট # মোছা. রাবেয়া রহমান, চৌধুরী গাঁও, বিশ্বনাথ, সিলেট # মো. সাজ্জাদুর রহমান সাগর, টেককামাল পুর, বিশ্বনাথ, সিলেট # হুমায়রা সিদ্দীকা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # শরিফ আহমদ, সৎপুর কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # শেখ সাব্বির আহমদ, প্রচার সম্পাদক, বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া, নবীগঞ্জ উপজেলা, হবিগঞ্জ # মো. রইছ উদ্দিন, পুরান পারকুল, কালারুকা, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট # নাহিদা জান্নাত মাসুমা, তৈয়বুন্নেছা খানম সরকারি কলেজ, জুড়ী, মৌলভীবাজার # ছাদির হোসেন, সৎপুর কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # মো. মাজিদুর রহমান, তেতইগাঁও রশিদ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, কামলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # মরিয়ম আক্তার, কামালপুর হাফিজিয়া ইবতেদায়ী মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # মো. ছিদ্দিকুর রহমান, কামালপুর হাফিজিয়া ইবতেদায়ী মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # মো. ছাদিকুর রহমান, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # হাফিজ মিজানুর রহমান, সভাপতি, গজনাইপুর, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # সুমাইয়া আক্তার, দিনারপুর ফুলতলী গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # সাদিয়া আক্তার (ঝুমা), মাইজপাড়া দাখিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, গাজীপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # রায়হান হোসেন, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # বদরুল ইসলাম, নোয়াগাঁও, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট # রাজনুর খাঁন, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # শাহরিণ আক্তার, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মহসিনা জান্নাত তাহেরা (আবিদা), ইয়াকুব টাওয়ার, লতিফিয়া আবাসিক এলাকা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মো. রেদওয়ানুল হক সোহাগ, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মো. আবু সুফিয়ান সাদি, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # আহমদ হোসেন তামীম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মোছা. ফারিয়া আক্তার জয়া, সরকারি জিল্লুর রহমান মহিলা কলেজ, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ # মুনাব্বিহ সাবিক, আলমদ্বীন, মঞ্জলাল, জালালপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # মো. নিজামুল হক সোহাগ, লতিফিয়া হিফযুল কুরআন সেন্টার, সোবহানীঘাট, সিলেট।

অদ্ভুত পৃথিবী

পৃথিবীর যেখানে কখনো বৃষ্টি হয়নি

যেখানে কখনো বৃষ্টি হয়নি। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এদেশ। তবে পৃথিবীর সবদেশ এমন শ্যামল হয়না। পৃথিবী সবদেশের জন্য তার সবুজ স্নিগ্ধ হাসিমুখ নিয়ে বসে থাকে না। পৃথিবীর একপ্রান্তে থাকে সাগর -মহাসাগর অন্য প্রান্তে থাকে মরুভূমি। কোথাও অতিবৃষ্টি, কোথাও বছরের পর বছর অনাবৃষ্টি। সব মিলিয়েই অদ্ভুত আমাদের এই পৃথিবী। আতাকামা মরুভূমি বা Desierto de Atacama এমন একটি অঞ্চল যেখানে ৪০০ বছরের মধ্যে বৃষ্টির দেখা মেলেনি। দক্ষিণ আমেরিকায় প্রশান্ত মহাসাগরের কোলঘেঁষে অবস্থিত এবং এটি চিলি, পেরু, বলিভিয়া ও আর্জেন্টিনা এই চারটি দেশকে ছুঁয়ে যাওয়া এদেশটি পৃথিবীর অন্যতম মরুভূমিময় একটি অঞ্চল। যেখানে কখনো বৃষ্টি হয়নি। আন্দিজ পর্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত বিশাল এ মরুভূমির আয়তন ৬০০ মাইল বা ১০০০ কিলোমিটার। চিলির একটি বিশাল এলাকাজুড়ে রয়েছে এ মরুভূমির বিস্তার। বিজ্ঞানীরা এই মরুভূমির প্রকৃত সংজ্ঞা দিয়ে একে বলে থাকেন absolute desert। এত বিশাল একটি জায়গায় যেখানে হাজার রকমের প্রাণী আর উদ্ভিদের বৈচিত্র্য থাকার কথা ছিল,সেখানে যুগের পর যুগ বৃষ্টিহীনতার কারণে মরুভূমিতে পরিণত হয়ে গেছে সব । মাইলের পর মাইল হেঁটে গেলেও দেখা মেলে না কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো এ মরুভূমি পৃথিবীর শুষ্কতম স্থান হওয়ার পরও তাপমাত্রা অনেকটা কমই বলা চলে। গড় তাপমাত্রা ১৮-২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই থাকে। তাপমাত্রা তুলনামূলক স্বাভাবিক থাকার কারণে এ মরুভূমির আশেপাশের এলাকাজুড়ে গড়ে উঠেছে জনপদ,তৈরি হয়েছে মানুষের বসবাস করার জন্য উন্নত শহর। যেখানে প্রায় ১০ লাখ মানুষ বাস করে। আতাকামাকে শুধু মরুভূমি, অনাবাদী জমি বললে ভুল হবে, এখানে রয়েছে বেশ কিছু মূল্যবান ধাতব ও খনিজের প্রাচুর্য । আতাকামাকে বলা হয় সোডিয়াম নাইট্রেটের স্বর্গভূমি। এছাড়াও তামা ও অন্য খনিজ পদার্থ রয়েছে এ অঞ্চলে যা মাইন প্রস্তুতে প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ১৯৪০ সালের বিশ্বযুদ্ধে আতাকামার সোডিয়াম নাইট্রেট অনেক মাইন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছিল। আতাকামা মরুভূমির একটি বিশেষ জায়গাকে নাসা মঙ্গলগ্রহের মাটির সঙ্গে তুলনা করা হয়। মেঘহীন আকাশ, শুষ্ক আবহাওয়া এবং আলোকোজ্জ্বল থাকায় বিজ্ঞানীরা এখানে জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত করেন। তাই এখানে গড়ে তুলেছেন রেডিও এসট্রোনমি টেলিস্কোপ। ক্লাইমেটোলজিস্টদের মতে, এখানে ১৫৭০ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কোন বৃষ্টিই হয়নি। তাদের মতে, এখানে প্রতি ১০০ বছরে গড়ে ৩ থেকে ৪ বার বৃষ্টি হয়। অবশ্য গত ৩০০-৪০০ বছরে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। আমরা পৃথিবীর একপ্রান্তে বাস করে বুঝতে পারিনা পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে কতটা রহস্য লুকিয়ে আছে। অদ্ভুত রহস্যময় সুন্দর এ পৃথিবী কতটা অজানা রূপ লুকিয়ে রেখেছে নিজের মধ্যেই।

হাসতে জানি

পাগলের কান্ড

সেদিন দিঘির ধারে দাঁড়িয়ে এক পাগল লোক তিন তিন বলে চিৎকার করছিল। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক ভদ্রলোক। তিনি পাগলকে বললেন এই কী হয়েছে তোমার? এভাবে চেঁচামেচি করছ কেন? জবাবে পাগল বলল- সাহেব, আগে একটু এদিকে আসেন পরে বলছি! কাছে যেতেই পাগল ভদ্রলোককে ধাক্কা দিয়ে দিঘিতে ফেলে দিয়ে এবার চিৎকার শুরু করল চার, চার, চার।

সংগ্রহে- **বদরুল ইসলাম** নোয়াগাঁও, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট

আবাবিল ফৌজের সদস্য হলো যারা

৩১২৯। মোছা. জান্নাতুল ফিরদাউস
পিতা: মো. হাবীব উল্লাহ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: কেন্দ্র মাথিউরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
গ্রাম: মাথিউরা (পূর্বপার)
ডাক: মাথিউরা বাজার
থানা: বিয়ানীবাজার
জেলা: সিলেট

৩১৩০। মোছা. ফাওযিয়া ফিরদাউস
পিতা: মো. হাবীব উল্লাহ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: কেন্দ্র মাথিউরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
গ্রাম: মাথিউরা (পূর্বপার)
ডাক: মাথিউরা বাজার
থানা: বিয়ানীবাজার
জেলা: সিলেট

৩১৩১। মো. মেহেদী মাহবুব (আল- আমিন)
পিতা: সুহেল আহমদ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: মাদরাসায়ে দারুস সুন্নাহ সিলেট
গ্রাম: রায়গড়
ডাক: রায়গড় বাজার
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩১৩২। নাজিবা রহমান তাহমিনা
পিতা: আবু সালেহ মো. লুৎফুর রহমান
গ্রাম: বড়ছাল
ডাক: নতুন বাংলাবাজার
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩১৩৩। ইশতিয়াক আহমদ মাহদী
পিতা: মো. আব্দুল বাকী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা
গ্রাম: সাদীপুর
ডাক: আবিদনগর
উপজেলা: ধর্মপাশা
জেলা:সুনামগঞ্জ

৩১৩৪। ফাওযিয়া তালুকদার
পিতা: নূর মোহাম্মদ তালুকদার
গ্রাম: নোয়াগাঁও
ডাক: ভূরকীবাজার
থানা: বিশ্বনাথ
জেলা: সিলেট

৩১৩৫। নূরুল নাবিল তালুকদার
পিতা: নূর মোহাম্মদ তালুকদার
গ্রাম: নোয়াগাঁও
ডাক: ভূরকীবাজার
থানা: বিশ্বনাথ
জেলা: সিলেট

৩১৩৬। মুহসিন বিল্লাহ সাদী
পিতা: মোহাম্মদ জাহির উদ্দিন
গ্রাম: সাতপাড়া
ডাক: সোনালী বাংলাবাজার
থানা: বিশ্বনাথ
জেলা: সিলেট

৩১৩৭। ফাহমিদা তালুকদার
পিতা: নূর মোহাম্মদ তালুকদার
গ্রাম: নোয়াগাঁও
ডাক: ভূরকীবাজার
থানা: বিশ্বনাথ
জেলা: সিলেট

৩১৩৮। নুসরাত জাহান জাকিয়া
পিতা- আপ্তাব উদ্দিন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-নূতন বাজার বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: কাকুরা
ডাক: জাতুয়া
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩১৩৯। তোফায়েল মিয়া
পিতা: তখলিছ মিয়া
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বিশ্বনাথ ডিগ্রি কলেজ
গ্রাম: পুরান সিরাজপুর
ডাক: বিশ্বনাথ
থানা: বিশ্বনাথ
জেলা: সিলেট

[আবাবীল ফৌজের বন্ধুরা! তোমরা যে কেউ পরিকল্পনা করে 'শব্দকল্প', 'বর্ণকল্প', সংখ্যাকল্প অথবা শিক্ষামূলক 'ছোটগল্প' ও 'ছড়া/কবিতা' লিখে পাঠাতে পারো। অবশ্যই লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলবে। আর মনে রাখবে, প্রত্যেক লেখার কপি রেখে পাঠাতে হবে, কারণ অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না।]

নিয়মাবলি

- আবাবীল ফৌজের সদস্য হতে হলে নির্ধারিত সদস্য কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠাতে হবে।
- ইসলামী ভাবধারার যেকোনো উন্নত মানের শিশুতোষ রচনা এ বিভাগে ছাপা হয়। সর্বোপরি শিশু-কিশোরদের প্রতিভা বিকাশ, তাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধনের জন্যই 'আবাবীল ফৌজ'।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হতে হবে। লেখার সাথে লেখকের পূর্ণ ঠিকানা থাকা চাই।
- বলতো দেখি, শব্দকল্প ও বর্ণকল্পের জবাব ও সমাধান চলতি মাসের ১৬ তারিখের মধ্যেই পত্রিকা অফিসে পৌঁছাতে হবে।
- 'বলতো দেখি'র সঠিক জবাবদাতাদের মধ্য থেকে নম্বরের ভিত্তিতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান নির্ধারণ করে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।
- আবাবীল ফৌজের যেকোনো সদস্যের তৈরি করে পাঠানো শব্দকল্প, বর্ণকল্প মনোনীত ও প্রকাশিত হলে তাকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।
- বর্ণকল্পে অংশগ্রহণকারী সঠিক জবাবদাতাদের নাম- ঠিকানা পরবর্তী সংখ্যায় যত্ন সহকারে ছাপানো হবে।
- A4 কাগজে স্পষ্ট করে হাতে লিখে অথবা কম্পোজ করে আবাবীল ফৌজের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
- ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই আবাবীল ফৌজ ও লেখার শিরোনাম উল্লেখ করতে হবে।
- ই-মেইলের ক্ষেত্রে প্রতিটি লেখা স্বতন্ত্র ফাইল করে মেইলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- প্রতিটি লেখার সাথে নিজের নাম, পূর্ণ ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর, শ্রেণি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে পাঠাতে হবে।

সড়ক দুর্ঘটনারোধে প্রয়োজন গণসচেতনতা

গত ২৫ নভেম্বর রাজধানী ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সামনে ফুটওভার ব্রিজের কাছে সড়ক দুর্ঘটনায় ইউসুফ মিয়া এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। তিনি এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে রাইড-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম পাঠাও-এ মোটরসাইকেল রাইডার হিসেবে কাজ করছিলেন। রাতে বাড়ি ফেরার সময় ইউসুফের মোটরসাইকেলের সঙ্গে অজ্ঞাত যানবাহনের ধাক্কায় দুর্ঘটনা ঘটে এবং এ ঘটনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।ইউসুফের এ ঘটনার মতো দেশে প্রায় প্রতিদিনই সড়কে ঝরছে প্রাণ। প্রতিদিনই খবরের কাগজে ভেসে উঠছে বীভৎস সব লাশের ছবি।

দেশে সড়ক দুর্ঘটনার কারণগুলো কমবেশি সবারই জানা। চালকের অসতর্কতা,অসচেতনতা, বেপরোয়া বা অনিয়ন্ত্রিত গতিতে গাড়ি চালনা,ত্রুটিপূর্ণ রাস্তা এসব দুর্ঘটনার প্রধান কারণ। সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ ওভারটেকিং প্রবণতা। অনেক সময় সংকেত না দিয়ে একজন আরেকজনকে ওভারটেক করার চেষ্টা করে,যার ফলে সামনের দিক থেকে আসা গাড়ি বের হতে না পেরে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। মহাসড়কে ধীরগতির যানবাহন চলাচল বন্ধ করা জরুরি। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ। সরকার,পরিবহণ মালিক ও শ্রমিক, যাত্রী সবাইকে সতর্ক ও সচেতন হতে হবে। মনে রাখতে হবে,সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি।

তৌহিদুল হক
শিক্ষার্থী, সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা

ভোট দিন যোগ্য ব্যক্তিকে

দেশের বিভিন্ন জায়গায় চলছে স্থানীয় সরকার নির্বাচন। তোড়জোর চলছে প্রতিনিধিদের প্রচারণা ও দৌড়ঝাপের। জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করার অন্যতম একটি মাধ্যম নির্বাচন। ভোট বিশেষ একটি আমানত। ভোটের ব্যাপারটি শুধু পার্থিব নয়;পরকালেও এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কোনও নির্বাচনী এলাকায় সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি প্রার্থী হলে তাকে ভোট না দিয়ে বিরত থাকা এবং অসৎ ও অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করা ধর্মীয় দৃষ্টিতেও গুরুতর অপরাধ। এজন্য যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে হবে।

বর্তমানে সব ধরনের নির্বাচনে টাকার ছড়াছড়ি ও বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে অনেক প্রার্থী নির্বাচনের পূর্বেই ভোট সংগ্রহ করেন,যা সম্পূর্ণ হারাম। আর যেসব ভোটার প্রার্থীদের যথাযোগ্যতা যাচাই-বাছাই না করে স্বজনপ্রীতি ও সাময়িক সম্পর্কের কারণে এবং সস্তা প্রতিশ্রুতি ও ঘুষের বিনিময়ে ভোট প্রদান করেন, আমানতের খেয়ানত করার কারণে তাদেরকে পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাই সৎ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী প্রার্থীকে ভোট দেওয়া প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব।

মো.মিজানুর রহমান
শিক্ষক, যমযম বাংলাদেশ শিক্ষা প্রজেক্ট, সিলেট